॥ একাদশ বর্ষ ॥

দ্বিতীয় সংখ্যা

॥ শ্রাবণ ১৩৬২ ॥

গল্প-ভারতী

ও সংস্কৃতি
এ কথা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি—যে ভারতীয় নারীর অঙ্গে যে শাড়ী শোভা পায় তাহা শুধু সুন্দর অঙ্গাভরণ নহে—তাহা ভারতীয় সংস্কৃতির একটা প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।
বহু প্রাচীনকাল হইতে এই আধুনিক ভারতনারীর যুগ পর্য্যন্ত যুগে যুগে ভারতের শিল্পীরা ভারতবর্ষের এই সাংস্কৃতিক রূপকে শ্রীতে, সৌন্দর্য্যে ও শোভায় ক্রমবর্দ্ধিত করিয়া আসিয়াছেন।
সেই শিল্পধারার চরম উৎকর্ষের সর্ব্বজন-স্বীকৃত নিদর্শন হইল ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউসের—নানা বর্ণের, নানা বৈচিত্র্যের ও নানা ডিজাইনের শাড়ী। ইহার প্রত্যেক বর্ণবিন্যাস ও বিভিন্ন ডিজাইনের পশ্চাতে আছে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পরিকল্পনা।
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
টাওয়ার লক • কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বাংলার
লক্ষ্মীশ্রী
ফিরিয়া আসুক!
লক্ষ্মী ঘি
পবিত্র ও বিশুদ্ধ
• লক্ষ্মীদাস প্রেমজী • ৮, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা • ফোন • ব্যাঙ্ক ৭২৪৫

বাংলার
লক্ষ্মীশ্রী
ফিরিয়া আসুক!
লক্ষ্মী ঘি
অর্দ্ধশতাব্দীর
উপর
সর্ব্বত্র সমাদৃত
পবিত্র ও বিশুদ্ধ
প্রেমজী

ও সংস্কৃতি
একথা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি—যে ভারতীয় নারীর অঙ্গে যে শাড়ী শোভা পায় তাহা শুধু সুন্দর অঙ্গাভরণ নহে—তাহা ভারতীয় সংস্কৃতির একটা প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।
বহু প্রাচীনকাল হইতে এই আধুনিক ভারতনারীর যুগ পর্য্যন্ত যুগে যুগে ভারতের শিল্পীরা ভারতবর্ষের এই সাংস্কৃতিক রূপকে শ্রীতে, সৌন্দর্য্যে ও শোভায় ক্রমবর্দ্ধিত করিয়া আসিয়াছেন।
সেই শিল্পধারার চরম উৎকর্ষের সর্বজন-স্বীকৃত নিদর্শন হইল ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউসের—নানা বর্ণের, নানা বৈচিত্র্যের ও নানা ডিজাইনের শাড়ী। ইহার প্রত্যেক বর্ণবিন্যাস ও বিভিন্ন ডিজাইনের পশ্চাতে আছে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পরিকল্পনা।
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
টাওয়ার ব্লক • কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

আদর্শ পথ্য
পানীয় ও খাদ্য
LILY
BRAND
BARLEY
লিলি
বার্লি
সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ
ও
স্বাস্থ্যপ্রদ

শ্রাবণ — ১৩৬২

সম্পাদক

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতি মাসের সাত তারিখে আমাদের নতুন বই প্রকাশ হয়।

* কবিপক্ষে বেরিয়েছে *

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
প্রিয়া ও পৃথিবী (কবিতাগ্রন্থ) ২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
ঠিক-ঠিকানা (উপন্যাস) ২৲

* ৭ই জ্যৈষ্ঠ বেরিয়েছে *

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
জ্যোতিষী (উপন্যাস) ২৲

ইন্দ্রনাথের
মিহি ও মোটা (রম্য রচনা) ২৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
স্ব-নির্বাচিত গল্প ৪৲

* ৭ই আষাঢ় বেরিয়েছে *

ধীরাজ ভট্টাচার্যের
সাজানো বাগান (গল্পগ্রন্থ) ২৲

নিরুপমা দেবীর
আলেয়া (গল্পগ্রন্থ) ২৲

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
সৃষ্টি (উপন্যাস) ৫৲

[illegible]কুমার মুখোপাধ্যায় অনূদিত
ফুটলো কুসুম
(কোরীয় উপন্যাস) ২৲

* ৭ই শ্রাবণ বেরিয়েছে *

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
স্ব-নির্বাচিত গল্প ৪৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কাচঘর (উপন্যাস) ৩৲

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সিন্দুর টিপ (গল্প) ২৷৷০

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত পরিক্রমা ৩৷০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
এখন যাঁদের দেখছি ৪৷৷০

২২শে শ্রাবণ কবি-স্মরণে প্রকাশিত

শ্রীসাগরময় ঘোষ সম্পাদিত
পরম রমণীয় (রম্যরচনা সঙ্কলন) ৪৲
বিদ্যাসাগর থেকে বর্ত্তমান সাহিত্যিক-বৃন্দের রচনায় সমৃদ্ধ।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড
গ্রাম : কালচার * ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭ * ফোন : ৩৪-২৬৪১

সুন্দর
কেশগুচ্ছ..
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল
কেশমূল সতেজ রাখে ও কেশের শ্রী বৃদ্ধি করে
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা・বোম্বাই・কানপুর

এই গ্রন্থে আছে

এফ.
এন.
গুপ্ত এণ্ড কোং
আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির সহায়ক

এই গ্রন্থে আছে

এই গ্রন্থে আছে

"ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে"
DELHI
সুলেখা
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কালিগুলির অন্যতম
ইহাতে "এস ১০০" সলভেন্ট আছে
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

এই গ্রন্থে আছে

এই গ্রন্থে আছে

●

এই গ্রন্থে আছে

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর
অনবদ্য অবদান
'হিমকল্যাণ'
কেশ তৈল
গুণে, গন্ধে
ও
রূপরচনায়
অপরাজেয়
HIMKALYAN
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা

একাদশ বর্ষ
২য় সংখ্যা

শ্রাবণ
১৩৬২

আমাদের কথা

রাশিয়ার শান্তি এষণা : কপট নয়

সংশয় এবং অপ্রীতি অপসারণের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ হচ্ছে অপরিচয়ের অপসারণ, অর্থাৎ পরস্পরকে জানা ; শোনা নয়। রাশিয়ার কথা যখন আমরা শুধু শুনতাম, তখন রাশিয়াকে যুদ্ধকামী সাম্রাজ্যলিপ্সু জাতি রূপেই বুঝতাম। অকস্মাৎ কখন্ রাশিয়া এসে ইংরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে ভারতবর্ষে নিজ সাম্রাজ্য স্থাপন ক'রে বসবে,—এই রুশ-ভীতি আমাদের বাল্যকালে 'জুজুর ভয়ের' মতই প্রবল ছিল।

অথচ পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের সুদূর অতীতে যেদিন ভারতভূমিতে রাশিয়ার প্রথম আগন্তুক আফানাসি নিকিটিন পদার্পণ করেছিলেন, সেদিন থেকে বহুকাল পর্যন্ত উভয় জাতির মধ্যে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও আসা-যাওয়ার ফলে একটা সুস্থ বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবই সৃষ্টি লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে নূতন ক'রে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রবর্তিত হওয়ায় আমরা পুনরায় জানতে আরম্ভ করেছি যে, রাশিয়া যুদ্ধলিপ্সু তত নয়, যত শান্তিলিপ্সু।

এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে সম্প্রতি রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল ভরোশিলোভের উক্তি থেকে। মার্শাল ঝুকোভের উপস্থিতিতে তিনি Indian Parliamentary Delegation-এর তের জন সদস্যকে সম্বোধিত ক'রে বলেছিলেন, 'মার্শাল ঝুকোভের দেহে আপনারা পদকের বিন্যাস দেখতে পাচ্ছেন। ঐ উজ্জ্বল সামগ্রীগুলি তিনি যুদ্ধ জয়ের দ্বারা লাভ করেছেন। এবার তিনি আর একটি বৃহৎ পদক লাভ করবেন শান্তি জয়ের দ্বারা।'

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রশস্তির মধ্যে মার্শাল ভরোশিলভ বলেন, 'রাশিয়াতে আমরা শান্তিই চাই, তা ছাড়া আর কিছু চাইনে। আমরা জানি আপনাদের প্রধান মন্ত্রী শান্তি ছাড়া আর কিছুই চাননা। শ্রীনেহরুর মানবপ্রীতি এত প্রবল যে, বিশ্ববিপত্তি এড়াবার জন্যে তিনি সব কিছুই করছেন। এই কারণেই তিনি আমাদের এত প্রিয় হয়েছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে আমরা উপলব্ধি করি যে, শ্রীনেহরু এবং ভারতের জনগণ সমস্ত বিশ্বের জন্য শান্তি চান, আর শান্তি বজায় রাখবার জন্যে সব কিছুই করছেন। এই জন্যই আমরা শ্রীনেহরুকে অভিবাদন জানাই, এবং রাশিয়ায় যখন তিনি আগমন করবেন দুই প্রসারিত বাহু দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থিত করব। আমরা জানি, শান্তির জন্যে লড়তে লড়তে, আর যুদ্ধকে এড়াবার জন্যে সবরকম ত্যাগ স্বীকার করতে করতে আমাদের জনসাধারণ আর আপনাদের জনসাধারণ একত্রে অগ্রসর হ'তে পারে।'

এই সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ় শান্তিদ্যোতক বাক্য ভরোশিলভের শুধু ব্যক্তিগত বাক্য নয়। এ বাক্য সমগ্র রুশ জনসমাজের বাক্য, একথা তিনি তাঁর উক্তির মধ্যে সুপ্রকাশ করেছেন।

এই শান্তি-সমর্থক বাক্যের সহিত রাশিয়ার সাম্প্রতিক শান্তি-সমর্থক

আচরণাদিকে একত্রে বিচার ক'রে দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় যে, যদিও রাশিয়া পূর্বে জঙ্গী পথেরই পথিক ছিল, বর্তমানে মত পরিবর্তন ক'রে সে শান্তির পথে পদার্পণ করেছে।

এখন প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব দিকও যদি প্রশান্ত মনোভাব ধারণ ক'রে রাশিয়ার সহিত সহযোগিতার পথে চলে তা হ'লে বিশ্ব-উত্তেজনা প্রশমিত হ'য়ে বিশ্ব-শান্তির সম্ভাবনা বাস্তব রূপ ধারণ করতে পারে। কারণ বিশ্বের শান্তি এবং অশান্তি উভয়ই প্রধানত নির্ভর করছে বিশ্বের দুই মহাশক্তি আমেরিকা এবং রাশিয়ার মনোভাবের উপর।

জেনেভা সম্মেলন

জেনেভা সম্মেলন মোটের উপর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এ কথা সকলেই বলছেন। ছয় দিনের বৈঠকান্তে প্যালেস্ অফ নেশনস্ হ'তে 'বৃহৎ চতুষ্টয়' যখন একের পর একে নির্গত হ'তে লাগলেন, তখন ক্যামেরার মুখে তাঁদের হাসির আমেজ ধরা প'ড়ে সেই কথারই সাক্ষ্য দিয়েছিল। বহু দূরে আমাদের দেশের সংবাদপত্রের অমসৃণ নিউজ্-প্রিণ্ট কাগজের উপরও, এমন কি রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিনের গভীরগুরু মুখেও, হাসির ক্ষীণ ঝিলিক দেখা গিয়েছে।

হাসির অবশ্য নানা কূট অর্থও আছে। কিন্তু সকলে যখন এক প্রসঙ্গে এক সঙ্গে হাসে তখন বুঝতে হবে সেটা সাধারণ অর্থের সন্তোষেরই হাসি।

জেনেভা সম্মেলন থেকে যেটুকু উপকার পাওয়া গেছে তা কম নয়। মাথার উপরের আকাশ অনেকটা নিরাপদ হয়েছে, এবং 'তুমিও বাঁচো—আমিও বাঁচি' ব্যবস্থার পথ দেখা গেছে। সে পথ অবশ্য এখনও কণ্টকাকীর্ণ; কিন্তু আগামী অক্টোবর মাসে জেনেভায় বৃহৎ রাজ্য

এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে সম্প্রতি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল ভরোশিলোভের উক্তি থেকে। মার্শাল ঝুকোভের উপস্থিতিতে তিনি Indian Parliamentary Delegation-এর তের জন সদস্যকে সম্বোধিত ক'রে বলেছিলেন, 'মার্শাল ঝুকোভের দেহে আপনারা পদকের বিন্যাস দেখতে পাচ্ছেন। ঐ উজ্জ্বল সামগ্রীগুলি তিনি যুদ্ধ জয়ের দ্বারা লাভ করেছেন। এবার তিনি আর একটি বৃহৎ পদক লাভ করবেন শান্তি জয়ের দ্বারা।'

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রশস্তির মধ্যে মার্শাল ভরোশিলভ বলেন, 'রাশিয়াতে আমরা শান্তিই চাই, তা ছাড়া আর কিছু চাইনে। আমরা জানি আপনাদের প্রধান মন্ত্রী শান্তি ছাড়া আর কিছুই চাননা। শ্রীনেহরুর মানবপ্রীতি এত প্রবল যে, বিশ্ববিপত্তি এড়াবার জন্যে তিনি সব কিছুই করছেন। এই কারণেই তিনি আমাদের এত প্রিয় হয়েছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে আমরা উপলব্ধি করি যে, শ্রীনেহরু এবং ভারতের জনগণ সমস্ত বিশ্বের জন্য শান্তি চান, আর শান্তি বজায় রাখবার জন্যে সব কিছুই করছেন। এই জন্যই আমরা শ্রীনেহরুকে অভিবাদন জানাই, এবং রাশিয়ায় যখন তিনি আগমন করবেন দুই প্রসারিত বাহু দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থিত করব। আমরা জানি, শান্তির জন্যে লড়তে লড়তে, আর যুদ্ধকে এড়াবার জন্যে সবরকম ত্যাগ স্বীকার করতে করতে আমাদের জনসাধারণ আর আপনাদের জনসাধারণ একত্রে অগ্রসর হ'তে পারে।'

এই সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ় শান্তিদ্যোতক বাক্য ভরোশিলভের শুধু ব্যক্তিগত বাক্য নয়। এ বাক্য সমগ্র রুশ জনসমাজের বাক্য, একথা তিনি তাঁর উক্তির মধ্যে সুপ্রকাশ করেছেন।

এই শান্তি-সমর্থক বাক্যের সহিত রাশিয়ার সাম্প্রতিক শান্তি-সমর্থক

আচরণাদিকে একত্রে বিচার ক'রে দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় যে, যদিও রাশিয়া পূর্বে জঙ্গী পথেরই পথিক ছিল, বর্তমানে মত পরিবর্তন ক'রে সে শান্তির পথে পদার্পণ করেছে।

এখন প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব দিকও যদি প্রশান্ত মনোভাব ধারণ ক'রে রাশিয়ার সহিত সহযোগিতার পথে চলে তা হ'লে বিশ্ব-উত্তেজনা প্রশমিত হ'য়ে বিশ্ব-শান্তির সম্ভাবনা বাস্তব রূপ ধারণ করতে পারে। কারণ বিশ্বের শান্তি এবং অশান্তি উভয়ই প্রধানত নির্ভর করছে বিশ্বের দুই মহাশক্তি আমেরিকা এবং রাশিয়ার মনোভাবের উপর।

জেনেভা সম্মেলন

জেনেভা সম্মেলন মোটের উপর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এ কথা সকলেই বলছেন। ছয় দিনের বৈঠকান্তে প্যালেস্ অফ নেশনস্ হ'তে 'বৃহৎ চতুষ্টয়' যখন একের পর একে নির্গত হ'তে লাগলেন, তখন ক্যামেরার মুখে তাঁদের হাসির আমেজ ধরা প'ড়ে সেই কথারই সাক্ষ্য দিয়েছিল। বহু দূরে আমাদের দেশের সংবাদপত্রের অমসৃণ নিউজ্-প্রিণ্ট কাগজের উপরও, এমন কি রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিনের গম্ভীরগুরু মুখেও, হাসির ক্ষীণ ঝিলিক দেখা গিয়েছে।

হাসির অবশ্য নানা কূট অর্থও আছে। কিন্তু সকলে যখন এক প্রসঙ্গে এক সঙ্গে হাসে তখন বুঝতে হবে সেটা সাধারণ অর্থের সন্তোষেরই হাসি।

জেনেভা সম্মেলন থেকে যেটুকু উপকার পাওয়া গেছে তা কম নয়। মাথার উপরের আকাশ অনেকটা নিরাপদ হয়েছে, এবং 'তুমিও বাঁচো— আমিও বাঁচি' ব্যবস্থার পথ দেখা গেছে। সে পথ অবশ্য এখনও কণ্টকাকীর্ণ; কিন্তু আগামী অক্টোবর মাসে জেনেভায় বৃহৎ রাজ্য

চতুষ্টয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রিগণের সম্মেলনে সে কণ্টকও কিছু উৎপাটিত হ'তে পারে ব'লে আশা হয়।

সম্মেলনে চারটি প্রসঙ্গ আলোচনাধীন ছিল, (১) দ্বিধাবিভক্ত জার্মানীর একীকরণ (২) ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা (৩) নিরস্ত্রীকরণ এবং (৪) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যোগবৃদ্ধি।

এই চারটি প্রসঙ্গের মধ্যে কোনটিরই চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয়নি; কিন্তু আলোচনার দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, এই চারিটি প্রসঙ্গেই সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হ'তে হবে,—এবং তা হ'লেই বিশ্বজোড়া যে ঠাণ্ডা লড়াই দিন-দিন তপ্ত থেকে তপ্ততর হয়ে উঠ্ছে, এবং যা যে-কোনো দিন আণবিক যুদ্ধে বিস্ফোরিত হ'তে পারে, সেই ঠাণ্ডা লড়াই প্রশমিত হ'য়ে বিশ্বে বহু-ঈপ্সিত এবং একান্ত প্রয়োজনীয় শান্তি স্থাপিত হ'তে পারে।

সম্মেলনে এ বিষয়েও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ভবিষ্যতে আণবিক যুদ্ধ নিবারিত করতেই হবে, যে-হেতু ঐ যুদ্ধে যুদ্ধান্তে বিজেতা ও বিজিত ব'লে কিছু থাকবেনা, যে মারবে সে-ও মরবে; বিশ্ব ধ্বংস হ'য়ে যাবে। অর্থাৎ ঢাকী শুদ্ধ প্রতিমা বিসর্জন হবে; জয়ঢাক বাজাবার জন্য কোনো ঢাকীই জীবিত থাকবেনা।

সম্প্রতি জন আষ্টেক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং কয়েকজন মনীষী, মায় আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু, আণবিক যুদ্ধের সর্বধ্বংসক ভয়াবহতা বিষয়ে জনসাধারণের বিশেষভাবে চৈতন্যোৎপাদন করায় জগতের বৃহৎ যুযুৎসুগণের টনক নড়েছে। তাঁরা বুঝেছেন প্রভুত্বলিপ্সার জন্য আণবিক অস্ত্রের দ্বারা মাতামাতি করলে জগতের আর সকল সামগ্রীর সহিত প্রভুত্বলিপ্সাও পুড়ে ছাই হবে।

এই বিষয়ে বহুপূর্বে ১৩৬০ সালের চৈত্র মাসে আমরা আমাদের

সম্পাদকীয় কথায় যে মন্তব্য করেছিলাম তা স্মরণ করলে অবান্তর হবে না। আমরা বলেছিলাম,—'কিন্তু কথা হচ্ছে, যন্ত্রে প্রতিক্রিয়া (তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রতিক্রিয়া) কিরূপ সূচিত হচ্ছে, তা পর্যবেক্ষিত হবার মতো সময় পাওয়া যাবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? হয়ত যন্ত্র, যন্ত্রে প্রতিক্রিয়ার সূচনা এবং প্রতিক্রিয়ায় সমুৎসুক পর্যবেক্ষক তিনই এক সঙ্গে এক মুহূর্তে তেজস্ক্রিয় ভস্মে পরিণত হ'য়ে যাবে। হয়ত দেখা যাবে প্রজ্বলিত বায়ুমণ্ডলের পীতবর্ণ অগ্নিরথে আরোহণ ক'রে প্রশান্ত মহাসাগরের দিক থেকে কোটি কোটি তেজস্ক্রিয় অণুরাক্ষসী বিকট আর্তনাদ করতে করতে ছুটে আসছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পৃথিবীবেষ্টনকারী সমগ্র বায়ুমণ্ডল উঠ্‌বে জ্বলে। সেই অতি-উত্তাপশালী হুতাশনের মধ্যে দগ্ধ হয়ে যাবে যাবতীয় জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী, তরু-গুল্ম-লতা, নদ-নদী-সাগর, এশিয়া-ইয়োরোপ-আমেরিকা —বিশ্ব-চরাচর। লুপ্ত হয়ে যাবে মানবজাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্ম, রামায়ণ-মহাভারত-ইলিয়ড, কালিদাস-রবীন্দ্রনাথ-শেক্সপীয়র, মালতী-মল্লিকা-রজনীগন্ধা। বায়ুহীন মৃত বসুন্ধরার বক্ষ-শ্মশান আবৃত ক'রে প'ড়ে থাকবে রাশি রাশি তেজস্ক্রিয় ভস্ম, যা ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পুনরায় জীবকোষের উদ্ভবের পক্ষে সম্ভাবনাময় হ'তে হয়ত লাগবে পাঁচ কোটি বৎসর। অথবা আর কোনো দিনই সেরূপ সম্ভাবনাময় হবেনা,—তেজস্ক্রিয় ভস্মের চিরমরুভূমি রূপে অনন্তকালের পথে যাত্রী হবে।'

এইরূপ ভয়াবহ চিত্র সম্প্রতি বৃহৎ চতুষ্টয়ের, বিশেষ ক'রে বৃহৎ দ্বয়ের, মনে উদিত হয়েছে ব'লেই বোধ হয় জেনেভা সম্মেলনে প্রসন্নতার সমীরণ অত সহজে প্রবাহিত হ'তে পেরেছিল। জেনেভা সম্মেলনে আণবিক যুদ্ধের সঙ্কটমোচন শুধু এক পক্ষেরই হয় নি,—উভয় পক্ষেরই

হয়েছিল। রামও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল, রাবণও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল।

এবার রাষ্ট্রনায়ক এবং বৈজ্ঞানিকের গর্হিত জোটের ডিম ভেঙে শুভবুদ্ধি যদি নির্গত হয় তা হ'লেই জগতের মঙ্গল। তা হ'লে যে আণবিক শক্তি মানুষকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল, তা-ই মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।

জেনেভা সম্মেলন ও শ্রীনেহেরু

বাহ্যতঃ জেনেভা সম্মেলনের পরিচালনার সহিত ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর কোনও সম্পর্ক না থাকলেও, বস্তুতঃ তাঁর প্রভাব যে তথায় উপস্থিত থেকে বহু উপকার সাধন করেছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সম্মেলনের অব্যবহিত পূর্বকালে রাশিয়া ভ্রমণের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগ্যানিনের সহিত নিবিড় সংযোগে, লণ্ডনে স্বল্পকালস্থায়ী অবস্থিতির মধ্যে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী স্যার অ্যান্টনি ইডেনের সহিত আলাপ আলোচনায় এবং শ্রীকৃষ্ণ মেননের মাধ্যমে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত কূটনৈতিক চর্চায় এ কথা শ্রীনেহেরু সংশয়াতীত ভাবে উক্ত তিন জনের মনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচতে যদি হয় শান্তি এবং সহ-অস্তিত্ব ভিন্ন অপর কোনো পন্থা নেই ; যুদ্ধের দ্বারা শান্তি আসবে না, আণবিক যুদ্ধের দ্বারা আসবে সামগ্রিক বিনষ্টি।

এই বিশ্বাস, এই প্রতীতি উৎপাদন করতে পেরেছেন অনুভব করেছিলেন বলেই জেনেভা সম্মেলনের পরিণতির বিষয়ে শ্রীনেহেরু যেটুকু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা সত্য হতে পেরেছে। তিনি বলেছিলেন

সম্মেলনে আবহাওয়া সহযোগিতার হবে কিন্তু প্রথম কিস্তিতে বেশি কিছু প্রত্যাশা করা উচিত হবেনা।

ফল ফলবার পূর্বে অনুকূল আবহাওয়ার প্রয়োজন। আর, এই অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবার বিষয়ে ভারতের, প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষ, কিছু অংশ আছে।

পূর্ববঙ্গে বাঙলা ভাষার উন্নয়ন চেষ্টা

পূর্ববঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী জনাব আসরাফুদ্দিন আমেদ চৌধুরী সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, পূর্ববঙ্গ গভর্মেণ্ট বাঙলা ভাষার উন্নতি সাধন এবং বাঙলা সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার স্ফূর্তির জন্য একটি বাঙলা আকাদেমি প্রতিষ্ঠার কল্পনা করছেন।

এই সাধু অভিপ্রায়ের জন্য আমরা পূর্ববঙ্গ গভর্মেণ্ট এবং জনাব চৌধুরীকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

বাঙলা ভাষা, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালীর উত্তরাধিকার পৈতৃক সম্পদ। এই সম্পদের বিষয়ে বহুদিন থেকে পূর্ববঙ্গীয় বাঙালীর যত্ন এবং আগ্রহ দেখে সেই শুভদিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করে রইলাম, যেদিন পশ্চিমবঙ্গ ঈর্ষার চক্ষে পূর্ববঙ্গের বাঙালা ভাষার উন্নত সত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে।

নৈতিক সমর সঙ্ঘ : MRA

সম্প্রতি কলিকাতায় নৈতিক সমর সঙ্ঘের (Moral Re-Armament Association) প্রায় ত্রিশজন সদস্য তাঁদের আদর্শবাদ প্রচারের জন্য শুভাগমন করেছিলেন। এই সদস্যগণের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য

প্রাচ্য ও ইয়োরোপের অন্তর্গত ছাব্বিশটি বিভিন্ন জাতির প্রসিদ্ধ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন।

এই সঙ্ঘের আদর্শ হচ্ছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল জাতিকে নিকটতর বন্ধনে এনে সকলের মধ্যে পরিচয়, সহিষ্ণুতা এবং সৌহৃদ্য স্থাপিত করা, এবং তদ্দ্বারা সম্প্রতি পৃথিবী যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দ্বারা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তাকে বস্তুতঃ ঠাণ্ডা করা। অর্থাৎ একটা নূতন আকারের বিশ্ব-ব্যবস্থা স্থাপিত করা।

এঁদের আলোচনা ও বক্তৃতা হ'তে বোঝা গিয়েছিল যে, মহাত্মা গান্ধী প্রচারিত শান্তিবাদই এঁদের আদর্শের মেরুদণ্ড। বৈপ্লবিক আফ্রিকান ন্যাশানাল কংগ্রেস ইউথ লীগের প্রতিষ্ঠাতা Dr. William Nkmo তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে, MRA-এর সংস্পর্শে আসবার পূর্বে তিনি মনে করতেন, দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিঘটিত সমস্যাসমূহের একমাত্র মনুষ্যসাধ্য সমাধান ছিল সাদা আদমির বিরুদ্ধে কালা আদমির রক্তাক্ত বিপ্লব। এখন তিনি বুঝেছেন যে হিংসার দ্বারা হিংসা নিবারিত করা যায় না; এবং প্রতিবেশীর জীবননাশের অভিসন্ধি করবার কোনো কারণ থাকে না, যদি তাকে নিয়ে একটা নূতন বিশ্বের পরিকল্পনা করা যায়।

MRA-অনুসৃত নীতিই একমাত্র নীতি যদ্দ্বারা বিশ্ব-উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হ'তে পারে। আমরা সর্বান্তঃকরণে MRA সঙ্ঘের ত্বরিত অগ্রগতি কামনা করি।

কিছু পূর্বে গল্প-ভারতীতে প্রচারিত 'বিশ্ব-সাহিত্য শৃঙ্খলের' সহিত MRA প্রতিষ্ঠানের প্রায় সর্বাঙ্গীন মৈত্রী আছে।

শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাতবাস

শ্রীমতিলাল রায়

শ্রীঅরবিন্দ প্রস্থান করিলেন; আমি কিন্তু আর পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইলাম না। সংসার-সংগ্রাম হইতে বিরত হওয়ার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিলাম। সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য আমার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অভাবের প্রতিকার চুলায় গিয়া অবস্থা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, তাহা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলাম। যখন আমায় অভাব-অভিযোগ বিকটরূপে নাকাল করিত, অন্তরে-অন্তরে শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্র স্মরণ করিয়া বলিতাম: "মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।" এই সময়ে একটু-আধটু বিপদের কাজেও জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম। গোলযোগের সম্ভাবনা বুঝিলে, মনে-মনে স্মরণ করিতাম: "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। অন্তরে পাপের উদয় হইলে, ভাবিতাম—"অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" মন্ত্রগুলি আমার নিকট নূতন ছিল না; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্র দেওয়ার পর হইতে মন্ত্রগুলি আমার নিকট নূতন আকারে ধরা দিত। শ্রীঅরবিন্দের নিকট এই মন্ত্র পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। শুনিয়াছি—এই সময়ে তিনি অযাচিতভাবে অনেককেই মন্ত্র দান করিতেন। কিন্তু আমার জীবনে বিপদ্‌রাশির মধ্যে কে যেন গুঞ্জন তুলিত! আমার মনে হইত—অনেক দায় হইতে মুক্তি পাইয়াছি মন্ত্রের প্রভাবে। আজ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই—মন্ত্রের প্রতি ইহা শ্রদ্ধা-বিশ্বাস না মন্ত্রদাতার প্রতি অন্তরের নিবিড় অনুরাগ! তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্রের সঙ্গে-সঙ্গে মন্ত্রদাতাকেই মনে হইত। এই সময়ে গলা ছাড়িয়া গাহিতাম—

"ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ, গোবিন্দ আমার প্রাণ-রে।
ঐ হরি নাম যে করে, সেই আমার প্রাণ-রে॥"

আমি শ্রীঅরবিন্দকে ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে পারিতাম না। শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত তখন আর কিছুই ছিল না। গাহিতে-গাহিতে চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতাম। এক্ষণে শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় আমার সবখানি ডুবিয়া গেল। গাড়ী-ঘোড়া বিক্রীত হইয়া গেল। পূর্ব্বে হইলে আমার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই বিষয়ে কাজ হইত, কিন্তু এখন ভগবানের হাতে সব ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। আমি আত্মসমর্পণ-যোগ সিদ্ধ করার জন্যই ব্যস্ত হইয়াছি। সেই সময়ে আমার বন্ধু আসিয়া আমায় খবর দিল: "ব্যাপার কিছুই বুঝিতেছি না; কিন্তু অরবিন্দবাবুর কোন খবরই পাইতেছি না।" তিনি সেখানে গিয়া পত্র লিখিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু এক মাস গত হইল, তাহার কোন পাত্তাই নাই। শ্রীঅরবিন্দের জন্য ভাবিতে বসিলাম; পরিশেষে স্থির করিলাম যে, যে ভদ্রলোক তাঁর সেবার শেষাশেষি ভার লইয়াছিলেন, তাঁহাকে পণ্ডিচারী পাঠাইয়া সংবাদ লওয়া হউক। সহর খুব বড় নয়, নিশ্চয় তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইবে। অতএব সুদর্শনকে ডাকিয়া পাঠান হইল। সুদর্শন আসিলে, তাহাকে পণ্ডিচারী যাওয়ার কথা বলিলাম। সে সহজেই রাজী হইল। তাহাকে পণ্ডিচারী পাঠাইয়া দিলাম।

বৈশাখ মাস—বাড়ীতে কলসোৎসর্গের একটা উৎসব ছিল। বন্ধুটী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, শ্রীঅরবিন্দ ভালই আছেন। আরও শুনিলাম যে, শ্রীঅরবিন্দের আগমনোপলক্ষ্যে পণ্ডিচারীর ষ্টীমার-ঘাটে এক শোভাযাত্রার আয়োজন হইয়াছিল। এই সময়ে কয়েক জন প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা এক প্রকার বন্দী অবস্থায় পণ্ডিচারীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন

ভি, এস, আয়ার। অপর জন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। তামিল-কবি ভারতীকেও এই শোভাযাত্রায় যোগ দিতে হইয়াছিল। তাঁহারা মহা-সমাদরে শ্রীঅরবিন্দের অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন: "একান্ত অজ্ঞাতবাস করিতেই এখানে আমার আগমন। পরে কি করিব, ভাবিয়া কিছুই স্থির করি নাই।" তিনি শোভাযাত্রা হইতে এই ভাবে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তিনি একটা সামান্য বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতেই বাস করেন। এই শোভাযাত্রা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তিনি গোপনেই বাস করার সুবিধা পাইয়াছেন। তাঁহার সন্ধান কেহ এখনও পায় নাই। সুদর্শন পরিশেষে জানাইল যে, পত্রাদির আদান-প্রদানের জন্য ব্যবস্থা করিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। পরিচিত লোক নূতন স্থানে আসিয়া লাভ করা সম্ভবপর নয়। পুরাতন বন্ধুদের সহিত পত্রাদির আদান-প্রদান করিতে হইলে, শীঘ্রই জানাজানি হইয়া যাইবে। তিনি চিরদিন খুব সতর্ক থাকিতেন। পণ্ডিচারীতে তাঁর অবস্থান বহুদিন তাঁহার দেশবাসী জানিতে পারে নাই। আমি, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রকুমার গুহরায় ও সুকুমার মিত্র, এই কয়জনে এই কথা জানিয়াছিলাম; কিন্তু আমার বিপ্লবী বন্ধুগণ শ্রীঅরবিন্দ কোথায় গিয়াছেন, তাহার সন্ধান গোপন রাখিতেন। বহুদিন তাঁহার সন্ধান কেহ করিতে পারে নাই। কিন্তু এক দল পুলিস, তিনি যে অরবিন্দ এই কথা জানিয়াছিল এবং দরজায় অনবরত পাহারা দিত।

তাঁহার সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ-রক্ষার ভার আমারই উপর পড়িল। শ্রীঅরবিন্দ সুদর্শনকে জানাইয়াছিলেন যে, চন্দননগরের সকল সংবাদই আমার নামেই আসিবে। এই কৃপা কেন তিনি করিয়াছিলেন, একথা আজ মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিতেছি। আর সুদর্শনের হাতে পণ্ডিচারীর একজন অধিবাসীর ঠিকানাও তিনি পাঠাইয়াছিলেন। এই ব্যক্তির ঠিকানায় পত্র

দিলে নিশ্চয় তিনি পাইবেন, এই কথা সুদর্শনকে তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন।

কথা শেষ হইলে, একটী মোড়া খাম হাতে দিয়া সুদর্শন বলিল: "ইহার মধ্যে তিনি সাধনার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তহা আপনার ব্যক্তিগত, একথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।" আমি তাহার হাত হইতে পত্রখানি উৎকণ্ঠিত চিত্তে লইলাম।

সুদর্শনের মুখে অতঃপর কলিকাতা হইতে ঠিকা গাড়ীতে কেমন করিয়া তিনি পথ অতিবাহন করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত শুনিতে-শুনিতে আমি অবাক হইয়া বসিয়া পড়িলাম। "সঞ্জীবনী" অফিস হইতে তাহার জিনিষপত্র বুঝিয়া পাইয়া তিনি সোজা ষ্টীমার-ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ডাক্তার সাহেবকে কেমন করিয়া বোকা বানাইয়া তিনি ষ্টীমারে উঠিলেন- তাহার মুখে ইংরাজী কথা শুনিয়া সাহেব জানাইয়াছিলেন যে, বাঙালীর মুখে এমন ইংরাজী কথা কোনদিন তিনি শুনেন নাই। শ্রীঅরবিন্দ ঠাকুর-গোষ্ঠীর এক জন বলায়, সেই পরিচয়ে ছাড়পত্র লাভ করেন।

আমার কিন্তু এই সকল কথার দিকে তখন বিশেষ মনোযোগ ছিল না। পত্রে তিনি কি লিখিয়াছেন, সেই কথা জানিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িলাম। ঘরে আসিয়া তাড়াতাড়ি দেখি - খামের মধ্যে একখণ্ড কাগজে উড্‌পেন্সিলে তিনটী মন্ত্র লিখিয়া তাহার তলায় তিনি লিখিয়া দিয়াছেন- 'প্রতিদিন তিন বেলা করিয়া প্রত্যেকটী হাজার বার জপিবে।'

আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। গুরুমন্ত্র তখন জপিয়া যাই যথারীতি। প্রাণায়ামের সঙ্গে মন্ত্র-জপ তখন ছাড়ি নাই। আচার-শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হইয়াছিল এবং তাহা ছাড়িবার কোনই কারণ ঘটে নাই। আমি নাসাপান করিতাম। প্রাণায়াম-সাধনায় কিছুটা

অগ্রসর হইয়াছিলাম। নেতি, ধৌতি প্রভৃতি ক্রিয়াযোগেও সিদ্ধহস্ত ছিলাম। হিন্দুত্বের যত কিছু আচার, সবই ছিল—তাহার উপর চাপিয়াছিল শ্রীঅরবিন্দের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা, যাহা সত্যই প্রাণে নূতন উৎসাহ সৃজন করিয়াছিল। স্মৃতির মাঝে তাঁহার কয়েকটা কথা পালন করার ভিতর দিয়া তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিই ফুটিয়া উঠিতেছিল। সংসারের আর সব যেন সেই বিগ্রহের মধ্যে লোপ পাওয়ার উপক্রম করিতেছিল। সেদিন আমার স্ত্রী আমায় হাতে কাগজখানি লইয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: "আবার কি কাণ্ড বাধল? চুপ ক'রে বসে' রইলে যে!"

আমি সব কথাই তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম: "এখন বল দেখি কি করি? শ্রীঅরবিন্দ বোধ হয় ভুলে গেছেন যে, আমার দীক্ষা হয়েছে। গুরু-মন্ত্রের উপর তাঁহার এই মন্ত্র কি করে' চালাই?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন: "বোঝার উপর শাকের আঁটি খুব চলে! এমন দু'-দশ গণ্ডা মন্ত্র তো তোমার আছেই। আর কয়েকটা পেলে, ভাবনা কিসের?"

কথা মিথ্যা নয়। মন্ত্র-লাভ সর্ব্বত্রই হইয়াছে। যে আমায় দেখিয়াছে, সেই মন্ত্র দান করিয়াছে। যে মন্ত্রধ্বনি আজ শ্রীমন্দিরে উঠে, তাহাও এক সন্ন্যাসীর দেওয়া। সে মন্ত্রের উচ্চারণে কালাকালের বিচার নাই। সকলেই সে মন্ত্র লইয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ। যাহা হউক স্থির হইল যে, গুরুমন্ত্র-জপের পর শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্র জপিব। আমার স্ত্রীও নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। মন্ত্র প্রকাশ করি নাই; তবে আমার আপন আচরণে, মন্ত্র তিনটী প্রকাশিত হইয়া পড়িত। শ্রীঅরবিন্দ দিয়াছিলেন আমায় জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের মন্ত্র। আমি

যথাসাধ্য তাহা গোপন রাখিতাম। আমার বিশ্বাস ছিল যে, বীজ মাটীর তলায় থাকে—তাহা প্রকাশ করিলে মন্ত্র তাহার অঙ্কুর-শক্তি প্রকাশ করে না। তাই মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ করিতে-করিতে আত্মসমর্পণের মহামন্ত্রই সিদ্ধ হইয়া উঠিল। সেই সাধনার বিস্তৃত ইতিহাস প্রকাশযোগ্য নহে। আমি জীবন-মরণ খেলায় প্রমত্ত হইয়া যে উন্মাদ হইয়াছি, তাহা এই মন্ত্রশক্তির প্রভাবেই। সে-কথা যথার্থরূপে প্রকাশ করিতে পারিব সেইদিন, যেদিন আমার জীবনান্ত হইবে।

শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রই জয়ী হইল। শ্রীঅরবিন্দ হইলেন আমার গুরু। আসন গেল, প্রাণায়াম গেল, নেতি-ধৌতি শিকায় উঠিল। রাত্রি-দিন কেবল মন্ত্র জপি। মন্ত্র যেন আমায় ছাড়িতে চাহে না। সে মন্ত্রের অপূর্ব্ব রহস্য অন্তরকে আলোকিত করিল।

প্রথমে মন্ত্রের লড়াই বাধিল—গুরু-মন্ত্রে ও শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রে। গুরু-মন্ত্র বলেঃ 'যদি অন্য মন্ত্র জপ, আমায় বিদায় দাও, ঘোরতর অভিশাপ দিব।' শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্র সে কথা শুনে না। যথারীতি আমায় জপাইয়া লয়। শেষে এমন হইল যে, তিন হাজার তিন বেলায় নয়—সর্ব্বক্ষণই মন্ত্র-চিন্তা যেন লাফাইয়া-লাফাইয়া হৃৎপিণ্ডে টোকা মারিতে লাগিল। গুরুর মন্ত্র লয় পাইল, শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রই জাঁকিয়া বসিল।

কেবল গুরু-মন্ত্রই লয় পাইল না, জন্মাবধি যে-সব অভ্যাস আমার সর্ব্বশরীরে ও মনে জড়াইয়া ছিল, তাহাও একে-একে খসিয়া পড়িল। শেষে এমন হইল যে, প্রাতঃকালে আসনে উপবেশন করা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল।

শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ পাইতাম প্রত্যক্ষে ও অপ্রত্যক্ষে। আমার অনুভূতিরও সমর্থন পাইতাম তাঁহার প্রেরিত পত্রের ছত্রে-ছত্রে। সে-

দিনের রাষ্ট্রক্ষেত্রে রুদ্রভৈরবের মত তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলাম ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই নয়, সে অনির্ব্বচনীয় মন্ত্রশক্তি দেশের ঘোরতর অবসাদ দূর করিয়া সেদিন জাতির বুকে আগুন জ্বালাইল। সমগ্র ভারতের মুক্তি-সাধনায় অগ্নিহোতা তরুণের দল অধ্যাত্মশক্তির অনুপ্রেরণায় উন্মাদের ন্যায় মহাহবে ছুটিয়া আসিল। একটা অশুদ্ধ রাজসিক কর্ম্ম-প্রবাহ আবিলতাশূন্য হইয়া অগ্নিময় সত্যের তিলকে ললাটকে উজ্জ্বল করিয়া দিল। আজ বুঝিয়াছি—তুমি আর আমি ভিন্ন আর কিছু নাই। বেদান্তের সেই 'ইদম্' আর 'অহম্'।

অসংখ্য কাজের মাঝে এই কথাটাই মনে রাখিতে হইত:—"অহংকার ছাড়, বাসনা ও চেষ্টা রাখিও না।" বাসনা ও অহংকার আছে কি-না, দেখিবার চেষ্টা হইত। শ্রীঅরবিন্দের বাণী—"No need of Asana or Pranayama." ইহা শুনিয়া ঐ সকল হইতে একেবারেই আমি নিবৃত্ত হইলাম।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের শেষে আমি পণ্ডিচারী গমন করিলাম। ইহার মধ্যে যে সকল পত্র তিনি দিয়াছিলেন, তাহা তিনি 'কোডে' লিখিতেন —সে 'কোড' পাইয়াছিলাম পার্থসারথির নিকট হইতে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের শেষে পার্থ-সারথি আমার নিকট আসেন এবং 'কোড' কি করিয়া 'ডিসাইফার' করা যায়, তাহার শিক্ষা দেন। অতঃপর শ্রীঅরবিন্দ আমায় 'কোডে' পত্র দিতেন, 'কোডেই' তাঁহাকে উত্তর দিতাম। দুঃখের বিষয়—সেই পত্রগুলি আমি পুড়াইয়া ফেলিয়াছি। তাঁহার স্বহস্তলিখিত এই কোডগুলি পাইবার আর কোন উপায় নাই।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষে আমি পণ্ডিচারী গমন করি এবং টাওয়ার-ক্লকের পশ্চাৎ যে বাড়ীখানি এখন বিদ্যমান আছে, তাহাতেই আমি উঠি। সঙ্গে ছিলেন দুই উকীল বন্ধু—৺নারায়ণচন্দ্র

কুণ্ডু ও ৺বনমালী পাল। এখনও বনমালী বাবুর কণ্ঠস্বর আমার স্মৃতি-পথে মধুবর্ষণ করে। তিনি যখন-তখন এই গানটী গাহিতেন—"শ্যাম-শুকনামে প্রিয় পাখী কোন্ দেশেতে উড়ে' গেল।"

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পাইবার জন্য আমি খুবই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। শুনিলাম—ওদঙ্গল নামক স্থানে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গীরা নিয়মিত খেলিতে আসেন। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রাণ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। যথাস্থানে গিয়া দেখিলাম—নলিনী ও সুরেশ ফুটবল খেলিতেছে। আমি কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। এক ব্যক্তি আমায় আসিয়া বলিল—"আপনি কি নূতন আসিয়াছেন?"

আমি বলিলাম—"হাঁ।"

তিনি আমার সহিত পরিচয় করিয়া বুঝিয়া লইলেন আমিই মতিবাবু। তারপর ইশারায় আহ্বান করিয়া আমায় জোসেফ ডেভিডের বাড়ী লইয়া গেলেন এবং যথারীতি পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীঅরবিন্দের সহিত সুযোগের সূত্র এইভাবেই আমি লাভ করিলাম। সেই সুখস্মৃতি আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই।

শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎকার হইল একখানি বৃহদাকার বাড়ীতে, সে-কথা পরে বিশদ করিয়া বলিতেছি।

—"সাংসারিক সুখের জন্য আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধি থাকিলে ঐহিক ও পারত্রিক পরস্পর-বিরোধী নহে; পরস্পর পরস্পরের সহায়।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

শেষ বৈঠক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৩

পূর্বেই বলেছি সন্ধ্যার পূর্বে সামনের বাড়ির শ্রীমতী শোভা দুই বেড়াতে এসেছিলেন।

নিকটে একটা চেয়ার গ্রহণ ক'রে চিন্তিত-মুখে শোভা বল্লেন, "কি ব্যাপার কাকাবাবু?"

বললাম, "ব্যাপার ত মন্দ নয়।"

"আছেন কেমন?"

"ভাল আছি।"

"তবে যে ডাক্তাররা আপনাকে দেখ্‌তে আসা-যাওয়া করছেন? কাল দুপুরে দেখলাম দু'জন ডাক্তার আপনাকে পরীক্ষা করছেন। ভাবলাম সন্ধ্যার সময়ে আপনাকে দেখ্‌তে আসব; কিন্তু সন্ধ্যা থেকে আপনার ওপর আর নীচের ঘরে আলো নেভানো দেখে ভাবলাম আপনি হয়ত' বিশ্রাম নিচ্ছেন, যাওয়া উচিত হবে না। তারপর রাত দশটায় দেখি আপনি আলো জেলে লিখে চলেছেন। আজ সকাল ছ'টার সময়েও দেখি সেই আপনি ব'সে ব'সে লিখছেন। তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম, ব্যাপার কি?"

বললাম, "ব্যাপার খুবই সরল; আমার কাজ আমি ক'রে চলেছি, আর ডাক্তারদের কাজ ডাক্তাররা করছেন। আপাততঃ তাঁরা আমাকে রামনামের মন্ত্র পড়াচ্ছেন।"

অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে শোভা বললেন, "কি যে বলেন কাকাবাবু!"

বললাম, "ভয় পেয়োনা; ওঁ শ্রীরাম রাম—এই ষড়ক্ষরের তারক-ব্রহ্ম মন্ত্র, যে মন্ত্র কাশীধামেও স্বয়ং বিশ্বেশ্বর মুমূর্ষু ব্যক্তির কানে দিয়ে পার করেন, সে মন্ত্রের কথা বলছিনে।"

সকৌতূহলে শোভা জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে ডাক্তাররা আপনাকে রাম-মন্ত্র পড়াচ্ছেন তার কি মানে?"

বললাম, "তার মানে, দীর্ঘকাল থেকে আমার নাড়ী এলোমেলো ছন্দে চলে; কখনো কম, কখনো বেশি, কখনো হয়ত' বা ঠিক। এই রকম এলোমেলো নাড়ীকে ভূতুড়ে নাড়ী বলে। সম্প্রতি আমার ভূতুড়ে নাড়ীতে ভূতের উপদ্রব একটু বেশি দেখা দিয়েছিল; তাই ডাক্তাররা রাম-নামের মন্ত্রের দ্বারা আমার নাড়ীর ভূতকে ভাগাবার চেষ্টায় আছেন। ভাগিয়েছেনও প্রায় সবটাই, যেটুকু বাকি আছে তার আয়ু বেশি দিনের নয়। তারক-ব্রহ্ম মন্ত্রের অক্ষর ছ'টি, ওঁ শ্রীরাম রাম; ডাক্তারদের রাম-মন্ত্রের সাতটি---ঔষধ ও বিশ্রাম। বিশ্রামের মধ্যেও রাম-নামের রেশ আছে।"

রাম-মন্ত্রের ভাষ্য শুনে পুলকিত হ'য়ে শোভা হাসতে লাগলেন। দু-চার কথার পর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "বেশিক্ষণ বসলে আপনার বিশ্রাম আর লেখা দুইয়েরই ব্যাঘাত হবে, আবার আসব, আজ চলি।"

"এস।"

অনেকের জীবন-বীণায় সংসারের মোটা তার ছাড়া আরও একটি-দুটি সূক্ষ্ম তার থাকে, যার অনুরণন জীবনের মোটা তারকে অতিক্রম না ক'রেও সুরেলা করে। ইংরাজিতে যাকে hobby বলে, আমি

ঠিক সে ধরণের সূক্ষ্ম তারের কথা বলছিনে। সিনেমা দেখা, ফুটবল ম্যাচ দেখা, যাত্রা শোনা, ঘোড়দৌড়ে বাজি লাগানো,—এ-সবের কথা আমি বলছিনে; এগুলি hobby বা সখের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হবার উপযুক্ত। এগুলির সবগুলিকেই আমি হেয় অথবা অবহেলনীয় নিশ্চয় বলছিনে; কিন্তু আমার সূক্ষ্ম-তারের তালিকা আরম্ভ হচ্ছে, গ্রন্থ-পাঠ, ছবি-আঁকা, সাহিত্য-চর্চা, ধর্মানুশীলন, অধ্যাত্মসাধন প্রভৃতি থেকে।

শ্রীমতী শোভার জীবন-বীণায় দুটি সূক্ষ্ম তার আছে,—একটি সাহিত্য-রচনার এবং অপরটি অধ্যাত্মসাধনার। একটির জন্য মন প'ড়ে থাকে খাতায়, অপরটির জন্য মঠে। কোথায় বেশি প'ড়ে থাকে সেটা আমি সব সময়ে ঠিক বুঝতে পারিনে। শ্রীমতী শোভা রামকৃষ্ণ মঠের বর্তমান প্রেসিডেন্ট-মহারাজ স্বামী শঙ্করানন্দের ভক্তিমতী মন্ত্র-শিষ্যা।

শোভা প্রস্থান করার ক্ষণকাল পরেই এলেন কবি কৃষ্ণধন দে।

"কেমন আছেন দাদা?"

বললাম, "ভাল। তুমি ভাল আছ ত?"

আসন গ্রহণ ক'রে কৃষ্ণধন বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল আছি।"

টেবিলের উপর বর্তমান আষাঢ় মাসের শনিবারের চিঠি প'ড়ে ছিল। ক্ষণকাল একথা-সেকথার পর শনিবারের চিঠির উপর কৃষ্ণধনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। কাগজখানা হাতে নিয়ে তিনি পাতা ওল্টাতে লাগ্‌লেন।

বললাম, "এই সংখ্যায় শ্রীনারায়ণ চৌধুরী প্রসঙ্গ-কথায় পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। মনে হ'ল কিছু কৌতূহলোদ্দীপক প্রসঙ্গ প্রবন্ধটিতে আছে।"

"পড়েছেন প্রবন্ধটা?"

"ভাল ক'রে পড়িনি, উল্টে-পাল্টে দেখেছি।"

পাতা উল্টে উল্টে লেখাটা বার ক'রে কৃষ্ণধন বললেন, "পড়ব না-কি প্রবন্ধটা? শুনবেন?"

বললাম, "বেশ ত পড় না।"

আগ্রহসহকারে কৃষ্ণধন প্রবন্ধটা পাঠ ক'রে শোনালেন।

পড়া শেষ ক'রে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগল দাদা?"

বললাম, "খাশা লাগল। বিশেষতঃ নগরকেন্দ্রিক লেখকদের সপক্ষে দুশ্ছেদ্য ভাষায় নারায়ণবাবু যে নিপুণ ওকালতী করেছেন, এবং তাঁদের গ্রন্থের যথোচিত সংস্করণ না হওয়ার কৈফিয়তে তিনি যে অতি-আশ্বাসকর অভিজাত যুক্তি দেখিয়েছেন, তার জন্যে নগর-কেন্দ্রিক লেখক মাত্রেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হবে।"

চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে কৃষ্ণধন বললেন, "এ-কথা আপনি কৌতুক ক'রে বলছেন না ত?"

ব্যগ্রকণ্ঠে বললাম, "না, না, মোটেই কৌতুক ক'রে বলছিনে। বস্তুতঃ, লেখক যদি শুধু পাঠক-জনতার মুখ চেয়ে লেখেন, তা হ'লে সাহিত্য-কারবারের দিক থেকে হয়ত তা উপযুক্ত কাজই হয়, কিন্তু সাহিত্য-সাধনার দিক থেকে হয় না। যে লেখক সাহিত্য-সাধনা করবেন, তিনি নিজের সমস্ত শিক্ষা-সংস্কার-রুচি-সাহিত্যবোধ নিয়ে আত্মস্থ হ'য়ে লিখতে বসবেন; সম্মুখে একান্তই যদি কোনো পাঠক থাকেন ত দেশের যিনি সবশ্রেষ্ঠ রসিক বিদগ্ধ পাঠক, একমাত্র প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট সাহিত্য-বস্তু ভিন্ন আর কিছুই যাঁর মনে রোচে না, তিনিই থাকবেন। তবেই উৎকৃষ্ট সাহিত্য-বস্তু রচিত হবে। আর, তা'তেও যদি না হয়, তা হ'লে ত পাশেই বাজে কাগজের ডালা আছে।"

কৃষ্ণধন বললেন, "এ-কথা অস্বীকার করা যায় না।"

বললাম, "এই প্রসঙ্গে বছর তিনেক আগেকার একদিনের একটা ঘটনা মনে প'ড়ে গেল। দক্ষিণ কলিকাতার বালীগঞ্জের এক প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য-সভা। বক্তা বাঙলা দেশের একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি। বিষয়-বস্তুর ঠিক কি অভিধা ছিল মনে নেই, তবে সাহিত্যের ব্যঞ্জনা এবং ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, সে-কথা সেদিনকার বিষয়-বস্তুর অন্তর্গত ছিল, তা মনে আছে।"

প্রসঙ্গক্রমে বক্তা একস্থানে বললেন, "সাহিত্যের ভাষা এ-রকম সহজ ও সরল হওয়া উচিত যাতে আমার অনুচর ও আমি ঠিক একই রকমে তা উপভোগ করতে পারি।" দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি বললেন, "শরৎ চাটুজ্জে মশায়ের ভাষা ঠিক সেই রকম ভাষা; তাই তাঁর লেখা এত জনপ্রিয় হ'তে পেরেছে।"

এই মন্তব্য সভায় একটা মৃদু গুঞ্জন উত্থিত করলে।

আলোচনাটা যখন শেষ মীমাংসার জন্য আমার ওপর এসে পড়ল, আমিও প্রতিবাদ করলাম। লেখকের কথার ভঙ্গী থেকে ধ'রে নেওয়া গিয়েছিল যে তাঁর অনুচর খুব উচ্চশিক্ষিত এবং মার্জিতরসবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না; তা যদি থাকতেন ত তাঁকে সাক্ষী মানার কোনও অর্থই থাকত না। প্রতিবাদে আমি ব'লেছিলাম, 'সাহিত্যকে সর্বজনবোধ্য, এমন কি বহুজনবোধ্য করবার জন্য যৎপরোনাস্তি সরল এবং সহজ না ক'রে মামুলি পাঠক যাতে উন্নত রসবোধ অর্জন ক'রে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা উচিত। সাহিত্যকে নিম্নে অবতরণ করলে হবে না, পাঠককে উচ্চে আরোহণ করতে হবে।'

শরৎচন্দ্রের লেখার দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে বলেছিলাম, 'হাতের কাছে শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ বই নেই, থাকলে দেখিয়ে দিতাম সে গ্রন্থে পল্লী-

রমণী বিশ্বেশ্বরী সময়ে সময়ে যে রকম অপরূপ ভাষা আর ছন্দের সঙ্গে কথা কয়েছেন তেমন বোধ করি স্বয়ং শরৎচন্দ্রও কথায়-কথায় কইতে পারতেন না। অনেক কাটাকুটি অনেক রদ-বদলের পর শরৎচন্দ্রকে বিশ্বেশ্বরীর অনেকগুলি সংলাপকে চোস্ত করতে হয়েছিল।'

সব জিনিস সকলের জন্যে নয়; সব গ্রন্থও সব পাঠকের জন্যে নয়। 'বিনোদ-বিনোদিনী' উপন্যাস পাঠ ক'রে যে পাঠক চরম আনন্দ পান, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' তাঁর পক্ষে সুপাঠ্য বই নয় সে কথা স্বীকার করি; কিন্তু সেই অপরাধে যদি 'ঘরে বাইরে' গ্রন্থকে সাহিত্যের তালিকা হ'তে বাদ দিতে হয় তা হ'লে ত সেইখানেই সৎসাহিত্যের সমাধি। কথা-সাহিত্য ত শুধু ঘটনার সরলতম বিবরণ নয়; কত সূক্ষ্ম জটিল হৃদয়-সংঘাতের জাল বুনতে হয় সেখানে। সে জাল ভেদ করা সকল পাঠকের কর্ম নয়। জীবন-বীণার নিগূঢ় তারে অন্তরের সূক্ষ্মতম অনুভবকে প্রকাশ করবার চেষ্টায় দরবারি কানাড়ার মীড়-মূর্ছনা চলছে, সেখানে কাহারবা তালের চাকাইকা চাক্‌তুন্‌ ছন্দে যারা সহজে মত্ত হয় তাদের এনে বসিয়ে দিলে তারা খুসি হবে কেন? শুধু পেলেই ত হয় না, গ্রহণ করবার শক্তি থাকাও চাই।

কৃষ্ণধন বল্‌লেন, "বটেই ত। গ্রহণ করবার শক্তি না থাকলে দেওয়া-নেওয়ার উভয় কারবারই পণ্ড!"

বললাম, "ঠিক বলেছ। কৌতুক রসের কথাই ধর না কেন। কৌতুক-রস সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট রস। এ রস ভারি কঠিন পাকের রস: হ'ল ত হ'ল, নইলে একেবারে ধোঁয়াটে গন্ধ। করুণ রসের কারবারে তবু খানিকটা ইনিয়ে-বিনিয়ে শেষ পর্যন্ত একটু হয়ত' চোখের জল ফেলানো যায়; হাস্যরসের কারবারে প্রথম ঘর্ষণেই জ্বল্‌ল ত জ্বল্‌ল, নইলে একেবারেই নিভল! অরসিকদের স্থূল রসবোধে সূক্ষ্ম কৌতুক-

শিল্প অনধিগম্য বস্তু। যতদিন থেকে রসের কারবার চলছে, ততদিন থেকেই এই অরসিকের দলও চলে আসছে। তাই বহু পূর্বকালে কোনো কবি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, হে বিধাতা, তুমি আমাকে অন্য দুঃখ যত ইচ্ছা দাও, কিন্তু, অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ,—অরসিকের কাছে রস-নিবেদনের দুঃখ কপালে লিখোনা। তাই ব'লে অরসিকদের খাতিরে সাহিত্য থেকে সরস রসের কারবার বাদ দেওয়াও ত যায় না। তাই বলছিলাম, সব সাহিত্যই সব পাঠকের জন্যে নয়।

অবশ্য, প্রচারধর্মী যে সাহিত্য, যে সাহিত্য শুদ্ধ সাহিত্য নয়, মিশ্র সাহিত্য; অর্থাৎ, যে সাহিত্য নিজে বিগ্রহ নয়, কোনো প্রকার গণ-আন্দোলনের বাহক, তা সে গণ-আন্দোলন রাজনীতি, সমাজনীতি, অথবা যে-কোনো নীতিরই হোক না কেন,—সে সাহিত্য রচনা করতে হ'লে জনতার মুখের দিকে খানিকটা চাইতেই হয়। কিন্তু যে কথা-সাহিত্যে উদ্দেশ্যের কণ্টক প্রবেশ করলে, তা সাহিত্যের মল্লিকা হ'তে পারবেনা, শক্তিশালী লেখনীর গুণে গোলাপ হয়ত' হ'তে পারে।"

কৃষ্ণধন বলেন, "কিন্তু নারায়ণ বাবুর এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আপনার সামগ্রিক মত কি দাদা? আমি ত মোটামুটি ওঁর প্রতিপাদ্য সমর্থন করি।"

বললাম, "আমিও করি। তবে সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে উনি যা বলেছেন সে বিষয়ে আমার কিছু বলবার আছে। সে কথা সুরু করবার আগে একটু জল খেয়ে নিই।"

(ক্রমশঃ)

প্রত্যয়

শ্রীআশা দেবী

এবার চাকরীটা হয়ে যাবেই—মল্লিকা ভেবেছিল। তিন মাস ধরে ধরে একটানা ঘোরাঘুরির পর এতদিনে একটু আশার আলো দেখতে পাওয়া গেছে। হেড্‌মিসট্রেস বলেছেন : আপনার জন্য আমি সাধ্য-মতই চেষ্টা করবো। তবে কি জানেন —

তবে? এই একটি শব্দই মল্লিকা যেন লেখা দেখতে পাচ্ছে কলকাতার সব জায়গায়। প্রত্যেকটি স্কুলে, প্রত্যেকটি অফিসে। চাকরী যে তার একটা দরকার এবং একান্তভাবেই দরকার সে-কথা কেউই অস্বীকার করে না। মধ্যবিত্ত পরিবারে যখন চারদিক থেকে ছাঁটাই আর বেকারী রাক্ষসের মত হাঁ করে আসছে যখন সরকারী লোনের টাকায় গড়া বড়দার ছোট ব্যবসাটা অবধারিতভাবেই ফেল পড়েছে,—এবং যখন অসুস্থ মা আর তিনটি ছোট ভাই-বোনের এক এক গ্রাস ভাত জোটানও অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন বি, এ পাশ মল্লিকার একটা ভালো আর ভদ্র চাকরী হওয়া দরকার বই-কি। তবে --

ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরের রোদ। পথটা পড়ে আছে মরা সাপের মত। যেন তার থ্যাঁতলানো ফণা থেকে কণা কণা বিষের জ্বালা ছড়িয়ে গেছে গরম হাওয়াতে।

ট্রাম স্টপের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললো মল্লিকা। একটু ছায়া নেই, একটু স্নিগ্ধতাও নেই। মাথার ভেতরে অসংখ্য সূচের মত বিঁধছে ধারালো রোদ, চোখের সামনে ধোঁয়া

ধোঁয়া দেখাচ্ছে সব। মনে পড়ে গেল, দিন দুই আগে কোন্ একটা অফিসে ছাতাটা হারিয়ে এসেছে—আর একটা কেনবার প্রশ্ন এখন সম্পূর্ণই অবান্তর।

কিন্তু কেন দেরী হচ্ছে ট্রাম আসতে? হয়তো তার-টার ছিঁড়ে গেছে কোথাও। প্রতিটা মুহূর্তকে এখন মনে হচ্ছে যুগান্তর। প্রত্যেকটা বাতাসের হল্কায় ঝলসে যাচ্ছে মুখের চামড়া। বেলা দুটো।

পাখীর মত উড়ে গেল একখানা ছোট প্রাইভেট গাড়ী। ড্রাইভ ক'রে গেল তারই বয়েসী এক বাঙালী মেয়ে। ক্ষণিকের জন্যে চোখে পড়ল পাউডার-লেপিত একটি সচ্ছল সুশ্রী মুখ। স্টিয়ারিং-এর ওপর রাখা সুগোল মণিবন্ধে একটি সোনালী-ঘড়ি। ওই মেয়েটি! ইচ্ছে করলেই তো ওকে একটা লিফ্‌ট দিতে পারতো। গাড়ীতে ওর তো জায়গার অভাব ছিল না। তবে—

মন্থর-ক্লান্ত-গতিতে একটা ট্রাম এলো। ভীড় নেই, কন্‌ডাক্‌টার থেকে যাত্রীরা পর্যন্ত সবাই যেন ঝিমুচ্ছে। মল্লিকা চুপ করে একটা ফাঁকা সিটে বসে পড়লো। কখনও কখনও সারা গায়ে এমন অদ্ভুত-ক্লান্তি ঘনিয়ে আসে কে জানতো! মনে হতে লাগলো সারা দুপুর এই ট্রামেই সে ঘুরে বেড়ায়—এটা যেন কখনও না থামে, তাকে যেন আবার মাটির ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়াতে না হয়!

পাশের বাড়ীর টুনু বৌদির কথা মনে পড়ছে। বেকার-স্বামী যখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্‌সচেঞ্জের দরজায় ধর্ণা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, টুনু বৌদি তখন মোড়ের সিগারেট-ওয়ালার কাছ থেকে পাতা আর তামাক এনে বিড়ি বাঁধতেন। কিন্তু না খেয়ে না নেয়ে তাঁর স্বামীর সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর ফল ফলেছে—কালকে মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত তুলেছেন তিনি!

একটা মস্ত ধাক্কা লেগে যেন হৃৎপিণ্ডের গতিটা বন্ধ হয়ে যেতে চাইলো মল্লিকার। জীবন—বেঁচে থাকা—! পীচ-গলা পথের ওপরে ঘন-রক্তে মাখামাখি হয়ে একটা কুকুর পড়ে আছে—খানিক আগে কোনো গাড়ীর তলায় চাপা পড়েছে। মল্লিকা সভয়ে চোখ সরিয়ে নিলো। একটা পরিণাম—একটা সংকেত!

ঠন্—ঠন্—ঠন্। ট্রাম চলেছে। ফুরিয়ে আসছে পথ। হঠাৎ একটা রোমাঞ্চকর সম্ভাবনায় উৎকর্ণ আর চঞ্চল হয়ে উঠলো মল্লিকা। হেড্‌মিস্‌ট্রেস্ ভরসা দিয়েছেন—হয়তো হয়েও যেতে পারে চাকরীটা। যদিও যাট টাকা মাইনে—তবু তো একটা দাঁড়াবার জায়গা। তবু তো ভরসা থাকবে দু-বেলা না হোক অন্তত এক-বেলার সংস্থান করা যাবে কোন রকমে! হঠাৎ মনের মধ্যে যেন খানিকটা জোর পেল সে, নিরাশার কুয়াসা কেটে গেল খানিকটা। মল্লিকা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—বাঁধ্‌কে—।

গম গম করছে স্কুল-বাড়ী। ক্লাশ চলছে পুরোদমে। টিচারদের ক্লান্ত-বিরক্ত তীক্ষ্ণ স্বর নানাদিক থেকে একটা সমবেত ঐকতানের মত বাজছে। একটা ক্লাশে তারই মত একটি অল্প-বয়সী মেয়ে ব্ল্যাক-বোর্ডে অঙ্ক কষছে। অল্প অল্প হাসছে ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে। ঈর্ষাভরা চোখে মল্লিকা চেয়ে রইলো। মনে পড়লো ম্যাট্রিকে সেও অঙ্কে লেটার পেয়েছিল একটা।

হেড্‌মিস্‌ট্রেসের ঘর খালি—বোধহয় ক্লাশ নিচ্ছেন। ভীরুভাবে একটা চেয়ারে বসে মল্লিকা অপেক্ষা করতে লাগলো। মাথার ওপরে পাখাটা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। অসহ্য গরমে শরীর জ্বলে যাচ্ছে—টপ্ টপ্ করে ঘাম পড়ছে কপাল দিয়ে। কিন্তু পাখাটা খুলে নেবার

সাহস সে পেল না। মিনিট তুই পরে একটা তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে হেড্ মিস্ট্রেস্ ফিরে এলেন। সসম্ভ্রমে মল্লিকা উঠে দাঁড়ালো। পাখার সুইচটা টেনে দিয়ে নিজের চেয়ারে বসে পড়ে হেড্ মিস্ট্রেস্ বললেন ঃ আপনি ? বসুন।

মল্লিকা বসলো। জিজ্ঞাসাভরা আকুল চোখে তাকিয়ে রইলো হেড্ মিস্ট্রেসের মুখের দিকে। ঠোঁটের গম্ভীর ভঙ্গি আর পুরু চশমার আড়ালে আচ্ছন্ন চোখ থেকে তাঁর মনের একটি কথাও অনুমান করা গেল না।

একটা ফাইলের ফিতে খুলতে খুলতে হেড্ মিস্ট্রেস্ বললেন ঃ অনেক চেষ্টা করেছিলাম আপনার জন্যে।

মল্লিকা নড়ে উঠলো একবার। বুকের ভেতরে যেন হাতুড়ি পড়ছে। আশা আর নিরাশার সন্ধিতে ঢেউ উঠছে রক্তের মধ্যে।

ঃ কিন্তু কিছুই করা গেল না। গভর্নিং বডির একজন মেম্বার তাঁর ভাইঝিকে এনে ঢুকিয়ে দিলেন। কি বলবো বলুন ? এ সব নেপোটিজমের জন্যেই কিছু করা যায় না—। ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হেড্ মিস্ট্রেস।

চেয়ারের গণ্ডীটার ভেতরে অসাড় অনুভূতিহীন মন নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলো মল্লিকা। কিছুক্ষণের জন্যে হেড্ মিস্ট্রেসের মুখটা কতগুলো ভগ্নাংশের মত টুকরো টুকরো হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো তার চোখের সামনে। তারপর সে উঠে দাঁড়ালো।

ঃ আচ্ছা, নমস্কার !

ফাইলে চোখ রেখেই মাথা নেড়ে হেড্ মিস্ট্রেস্ প্রতি-নমস্কার জানালেন। যেন সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বললেন ঃ ঠিকানা তো রইলই। দরকার হলে ডেকে পাঠাব। তবে—

তবে! দুই কান ভরে তবে শব্দটা শুনতে শুনতে পথে নেমে গেল মল্লিকা।

আবার সেই তীক্ষ্ণধার রোদ। আবার সেই অসহ্য ভয়ঙ্কর দুপুর!

মাথার ওপর দিয়ে রোদ কেটে গেল, লাল বিকেলের ছায়া ঘনালো চারদিকে। রৌদ্রজ্বলা পথের ওপরে দুধারের বাড়ীগুলোর দীর্ঘছায়া পড়তে লাগলো।

শূন্যপ্রায় ট্রামগুলোতে এখন অফিস-ফেরত মানুষের ভীড়। তারই মধ্যে লেডীজ্ সিটের কোণা ঘেঁসে কোনো মতে বসেছে মল্লিকা। ক্ষিদেয় পেটের নাড়িগুলো জ্বলছে। এক কাপ চাও জোটেনি বিকেলে। বাড়ী ফিরেও জুটবে কিনা মল্লিকার জানা নেই।

ট্রামে দম-চাপা মানুষের ভীড়। তার পাশেই বসেছে একটি সুসজ্জিতা মেয়ে। পরণে বাঙ্গালোর সিল্কের সাড়ী, একটি সুন্দর ব্লাউজ। গায়ে দু চারটি গয়না, হাতে একটি সৌখিন চামড়ার ব্যাগ। বেশ সুখী, বেশ পরিতৃপ্ত। মল্লিকা ঈর্ষ্যাকাতর চোখে চেয়ে রইলো। এও বাঁচা—। সচ্ছল—নিশ্চিন্ত হয়ে বাঁচা!

মল্লিকার ক্ষুধার্ত পীড়িত মনের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা বিপর্যয় ঘটে যেতে লাগলো। মনে হতে লাগলো—সব অর্থহীন। একটা মিথ্যে ভারের মত নিজের অস্তিত্বটাকে মিথ্যেই টেনে চলেছে। কিন্তু এই ভার সে আর বইতে পারছে না—চরম অবসাদে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। নিজের ওপরে এখনি তো সে সমাপ্তি টেনে দিতে পারে, আত্মহত্যা করতে পারে!

তাই ভালো—তাই ভালো। তীব্র তৃষ্ণার সামনে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলের মত এই ইচ্ছাটা তাকে আকর্ষণ করতে লাগলো। যে কোনো

একটা চল্‌তি গাড়ীর সামনেই তো ঝাঁপ দিয়ে পড়লেই চলে! দুপুর বেলায় দেখা সেই কুকুরটার মত একটা শান্তিময় নিশ্চিন্ত পরিণাম!

কিছুই বলা যায় না—হয়তো পরের স্টপেই নেমে পড়তো মল্লিকা, একটা অঘটনই ঘটিয়ে বসতো। কিন্তু আচম্‌কা একটা বিসদৃশ কাণ্ড ঘটলো ট্রামে।

ঃ চোর—চোর—

ঃ ছি—ছিঃ! মেয়েছেলের এই কাণ্ড!

ঃ দেখে তো মনে হচ্ছে লেখাপড়া জানা।

ঃ দিদিদের কলেজে কি আজকাল পিকপকেটিং শেখানো হয়?

ঃ মেয়েছেলে বলে ছেড়ে কথা কইবেন না, পুলিশে দিন!

ঃ থাক—থাক! কলমটা যখন নিতেই পারেনি তখন আর—

মল্লিকা পুতুলের মতো চোখ মেলে চেয়ে রইলো, সমস্ত জিনিষটা যেন সিনেমার ছবির মতো ঘটে যাচ্ছে। তারই পাশের সেই সুবেশা মেয়েটি! দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোকের কলমটা তুলে নিতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে!

সৌখিন কাপড়, আর দু' একখানা গয়নাও গায়ে! সব কিছুর অর্থই এখন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে মল্লিকার কাছে। এও বাঁচা—এও জীবন! আর এরই জন্যে সে এই মেয়েটাকে ঈর্ষ্যা করছিলো এতোক্ষণ!

প্রচণ্ড কোলাহল হচ্ছে ট্রামে। গাড়ীটা থেমে গেছে। সুবেশা মেয়েটি ট্রাম থেকে নেমে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার চারদিকে জনতার কদর্য্য কৌতূহল আর কুৎসিত মন্তব্যের বন্যা।

নিজের সিটে তেমনি চুপকরে বসে রইলো মল্লিকা। না—এখনও আত্মহত্যার কোনো কারণ ঘটেনি—এখনও ওই মেয়েটার মতো চূড়ান্ত

দীনতার অপমৃত্যুতে সে নেমে যায়নি। তার আশা আছে—তার এখনও সম্ভাবনা আছে!

আজ না হোক, আবার কাল! তারপরে আবার কাল আছে। একটা না একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। কতবড় ভয়ঙ্কর অপঘাত থেকে যে সে বেঁচে গেছে, সে কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ জীবনটাকে আশ্চর্য্য সুন্দর বলে মনে হলো মল্লিকার।

—"আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক সত্যের জয় হইবেই, প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মনুষ্য জাতিকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস-সম্পন্ন হও। নাম যশের ফাঁকা চাকচিক্যে কি হইবে? খবরের কাগজে কি বলে, না বলে, আমি তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকি না। তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে তো? তাহা থাকিলেই তুমি সর্বশক্তিমান হইলে। তুমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম তো? তাহা যদি হও, তবে তোমার শক্তি কে রোধ করিতে পারে? চরিত্রবলে মানুষ সর্বত্রই জয়ী হইতে পারে। ঈশ্বর তাঁহার সন্তানগণকে সমুদ্রগর্ভে রক্ষা করিয়া থাকেন। তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন—তোমরা বীর হও।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের কথা

—"যশের চারটি ধনী বন্ধু কাশীতে ছিলেন। তাঁদের নাম বিমল, সুবাহু, পুণ্যজিৎ এবং গবাম্পতি। যখন তাঁরা শুনলেন যে, যশ স্বীয় সুন্দর কেশরাশি কেটে ফেলে গৈরিক বসন পরেছেন ও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী সেজেছেন তখন তাঁরা যশের কাছে এলেন এবং যশ তাঁদিকে দেখে বুদ্ধদেবকে নিবেদন করলেন, 'ভগবন্, আমার চারটি বন্ধুকে আপনি ধর্ম্মালোক দিন।' যশের অনুরোধে বুদ্ধদেব তাঁর বন্ধু চতুষ্টয়কে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন। তাঁরা বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করে ধন্য হলেন। এইরূপে পাঁচ মাসের মধ্যে ষাটজন শিষ্য সংগৃহীত হ'ল। বুদ্ধদেবের বাণী যতই প্রচারিত হ'ল, ততই বুদ্ধদেবের নিকট লোক সমাগম বাড়তে লাগল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হলেন। যখন বুদ্ধদেব দেখলেন যে, সকলের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয় তখন তিনি সুযোগ্য শিষ্যবৃন্দকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধর্ম্মপ্রচারার্থ পাঠালেন এবং বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় তোমরা জগতে বিচরণ কর করুণার বশে। অজ্ঞানের অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। ধর্ম্মালোক দানে তোমরা সেই অন্ধকার দূরীভূত কর। কিন্তু অযোগ্য বন্ধুর নিকট এই আর্য্যধর্ম্ম প্রচার ক'রোনা। তবে যখন যোগ্য অধিকারীকে দেখবে তাকে ধর্ম্মশিক্ষা দেবে। তোমাদিগে ধর্ম্মপ্রচারের অনুমতি দিলাম। ক্রমশঃ এই প্রথা প্রচলিত হল যে, যখন আবহাওয়া ভাল থাকবে তখন ভিক্ষুগণ চারদিকে ঘুরে ঘুরে ধর্ম্মপ্রচার করবেন এবং বর্ষাকালে তথাগতের কাছে এসে থাকবেন।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা

—"একটা ভাব পাকা করে ধরে তাঁকে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো তাঁর উপর জোর চলবে। এই দেখনা, প্রথম প্রথম একটু আধটু ভাব যতক্ষণ, ততক্ষণ 'আপনি, মশাই' ইত্যাদি লোকে বলে থাকে, সেই ভাব যেই বাড়ল, অমনি 'তুমি-টুমি'—আর তখন 'আপনি-টাপনি'-গুলো বলা আসে না; যেই আরও বাড়ল, আর তখন 'তুমি-টুমি'তে সানে না; তখন 'তুই-মুই'। তাঁকে আপনার হতে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো হবে। যে ভগবানের জন্য সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার করে নিয়েছে, সে তাঁর উপর জোর করে বলে, 'তোর জন্যে সব ছাড়লুম, এখন দেখা দিবি কি—না—বল্?"

—"কার মুখ মনে পড়ে গো? সংসারে কাকে ভালবাস বল দেখি? ভাইপোকে? বেশ তো? তার জন্যে যা কিছু করবে, তাকে খাওয়ান, পরান ইত্যাদি—সব গোপাল ভেবে ক'রো। যেমন গোপাল-রূপী ভগবান তার ভিতর রয়েছেন, তুমি তাঁকেই খাওয়াচ্ছ, পরাচ্ছ, সেবা করছ, এই রকম ভাব নিয়ে ক'রো। মানুষের করছি ভাববে কেন গো? 'ভাবিলে ভাবের উদয় হয়। (ও সে) যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়॥ কালীপদ সুধা হ্রদে, চিত্ত যদি রয়, তবে পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ, কিছুই কিছু নয়।' ভাব চাই, বিশ্বাস চাই, পাকা করে ধরা চাই—তবে তো হবে। ভাব কি জান? তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতান, এরই নাম।"

দুরন্ত মন

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবর্ত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

একটি মাঝারি বাড়ীর একটি অংশে ব্রজনাথরা থাকে। দু'খানি ঘর—ফালি একটু বারান্দা—সঙ্কীর্ণ একটি রান্নাঘর—তারই একধারে একটি জলের টব বসানো। উঠোন নেই, আকাশ নেই। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা বাড়ীতে কোন মানুষও নেই। শুনেছিলাম ব্রজনাথের বিধবা মা, দুটি বোন, ছোট ভাই—আরও কে কে যেন আছেন, কিন্তু আপাততঃ কাউকে তো দেখছি না।

আমাকে অবাক হ'য়ে চাইতে দেখে ব্রজনাথ হয়তো আমার মনের কথা অনুমান করে নিল। বলল, মা পরশুদিন বরানগর গেছেন মামার ছেলের অন্নপ্রাশনে। কাল ফিরবার কথা ছিল, কেন যে ফেরেন নি ভাবছি। যাইহোক, আজ রাত্তিরে আর রান্নার হাঙ্গামায় কাজ নেই—দোকান থেকে খাবার আনিয়ে নিলেই চলবে। কি বল মিতা?

সুমিতা মাথা নেড়ে বলল, ভালই হবে। শুনেছি কলকাতায় উনুন জেলে রান্না করাটাই বোকামি। যে-কোন রেষ্টুরেণ্টে কি হোটেলে কিছু খেয়ে নিলেই যথেষ্ট।

আমি বললাম, যাদের কেউ নেই—তাদের ওসব সাজে। মেয়েরা যদি রাঁধতেই না শিখল—

তুই ন্যাকামো রাখ্‌ তো—কথা কইছেন যেন সাতকেলে বুড়ী! আমাকে ধমক দিল মিতা।

একটু হেসে বলল, কলকাতায় এসেছি কি হাতা-বেড়ি-কড়া ঠুন্‌ঠুন্ করতে—না বেড়িয়ে চেড়িয়ে সব দেখতে ?

ঠিক বলেছ মিতা—একথা আমিও স্বীকার করি। আপনারা কেন রান্নার কথা ভাবছেন ? কাল হয়তো মা এসে যাবেন—সব ঠিক হবে'খন। ব্রজনাথ আশ্বাস দিল আমাদের।

চা এল দোকান থেকে, খাবার এল। ঘরের মধ্যে সতরঞ্জি বিছিয়ে বসলাম আমরা। টি-পট থেকে পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে মিতা বলল, আসুন ব্রজবাবু—এ ক'দিনের টুর-প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলা যাক। আপিস থেকে ছুটি নিচ্ছেন তো ?

ছুটি! ব্রজনাথ হাসল। ছুটি না নিলেও চলবে। আমাদের দশটা-পাঁচটার বাঁধা আপিস হলেও কড়াকড়ি বিশেষ নেই। একবার সই করে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আসতে পারলেই সারাদিন নিশ্চিন্ত। প্রোগ্রাম অনায়াসে করতে পাবেন। মিস মিত্র—আপনি অত গম্ভীর হয়ে রয়েছেন যে ? ভাল লাগছে না বুঝি ?

না—ভালই তো লাগছে। অপ্রতিভভাবে উত্তর দিলাম।

সত্য বলতে কি—ভাল লাগছিল না আমার। কোথায় যেন অসঙ্গতি —কোথায় যেন বাধা অনুভব করছিলাম। অনাত্মীয় যুবক ব্রজনাথ— পরিবারের কেউই নেই বাড়ীতে—আমরা দু'জন হলেও তরুণী কুমারী মেয়ে—লোক চক্ষে দৃশ্যটি কটুই। শহরে অবশ্য সমাজ নেই—প্রতি- বাসীরাও প্রতিবাসী সম্বন্ধে নিস্পৃহ—, কিন্তু লোকাচারে অভ্যস্ত মনে কুণ্ঠার রাশি এসে জমছিল। সত্য কথা বলতে কি—ভয় ভয় করছিল। মিতা যতই স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠছে—ওর কথায় প্রগল্‌ভতা—আচরণে কুণ্ঠা-হীনতা যতই বাড়ছে আমার মন ততই অজানা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠছে।

ব্রজনাথ বলল, আপনারা দু'জনে পাশের ঘরে শোবেন—দরকার হলে ডাক দেবেন। আশা করি কোন অসুবিধা হবে না।

দোর বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম দু'জনে। মিতা বলল, ব্রজনাথকে কেমন লাগছে? ভারি চমৎকার মানুষ, নয়? বাড়ীটাও বেশ নিরালা।

বললাম, কাল যদি ব্রজনাথবাবুর মা না আসেন—আমি দেশে চলে যাব।

ইস্—এত ভয়! মিতা খিল খিল করে হেসে উঠল। পুরুষ মানুষকে তুই এত ডরাস! অথচ পুরুষ মানুষ না হলে আমরা ঘর সংসারের কথা ভাবতেই পারি না।

কিন্তু অনাত্মীয় পুরুষ----

অনাত্মীয়---আত্মীয় হতে কতক্ষণ। বাপ মা যার সঙ্গে বিয়ে দেন---সে কি আগে থেকে জানা-চেনা কোন আত্মীয়? ওই অজানাই এক নিমেষে হয়---পরম জানা, বুঝলি? আমার গায়ে ঠেলা মেরে মিতা পুনরায় হেসে উঠল।

বললাম, বিয়ে হয়ে গেলে আলাদা কথা। শাস্ত্র মতে—

মিতা বলল, শাস্ত্রও তো আমাদের তৈরী—মন-বোঝানো জিনিষ। ভালবাসাটাই হল আসল। হাজার মন্ত্র পড়লেও দু'টি হৃদয় এক হয় না—যতক্ষণ না আসল মন্ত্রটি পড়া হচ্ছে। ওইটাই হচ্ছে ভালবাসা।

বললাম, ঘুম পাচ্ছে।

আমার কিন্তু কথা বলতে খুব ভাল লাগছে। আচ্ছা শু, তুই কাউকে ভালবেসেছিস কখনো?

সে অবসর আর পেলাম কোথায়!

সে কি রে—রবি ঠাকুর কি বলেছেন জানিস না? আজ গাড়ীতে

আসতে আসতে ব্রজ বেশ বলছিল—চমৎকার আবৃত্তি করে ও। বলে আবৃত্তি করল :

পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে—
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিঃশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

সবার মনেতেই ওর আসন পাতা।

বললাম, মাথাটা বড্ড ধরেছে মিতা-- ঘুমুতে দে।

মিতা থামল—একটি লঘু নিশ্বাসও ফেলল। ওকি ব্যথা পেল আমার কথায় ?

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাত তখন গভীরই হয়েছে হয়তো। যান-বাহনের শব্দ কখনও অস্পষ্ট হয়ে বাজছে—কখনও বা পথচারীর দু'একটি উচ্চকণ্ঠের মন্তব্য। বাইরের পথে হয়তো তেমনি আলোর প্রবাহ আছে--কিন্তু এ গলির মধ্যে রাজপথ লুপ্ত। পাশের ঘরে ফিস্-ফিস্ শব্দ হচ্ছে—কারা যেন চুপি চুপি আলাপ করছে। মিঠে একটু হাসির আওয়াজ, চুড়ির ঠুনঠুন্ একটু রেশ। অন্ধকারের মধ্যে কারা যেন চলাফেরা করছে—নিশ্বাস নিচ্ছে। স্বপ্ন তো দেখছি না—সারা গায়ে শিরশিরানি ভাব—দম যেন ফুরিয়ে আসবে এখনই। আড়ষ্ট হাতটাও নাড়তে পারছি না যে মিতাকে স্পর্শ করে ফিরে আসব জীবনের রাজ্যে। কিন্তু জীবনের রাজ্যে ফিরে আসা আমার চাই—এভাবে চাপা ভয়ে দম বন্ধ হয়ে মরতে পারব না। হাত উঠিয়ে—মিতার গায়ে একটা ধাক্কা দিলাম। হাতখানা আছড়ে পড়ল বিছানায়। মিতা নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমার জড়ত্ব বা মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল—সবেগে

উঠে বসলাম বিছানায়। ঘরে আলো নেই—চারিদিকে অন্ধকারের সমুদ্র। সেই অকূল সমুদ্রে একা আমি ডুবে রয়েছি। দম নিচ্ছি ভেসে উঠবার জন্য, কিন্তু ক্রমশঃই তলিয়ে যাচ্ছি।

উপমায় পড়েছি—অকূল সমুদ্রে যেন একগাছি তৃণ—তাই দেখেও মানুষের মনে আশা জাগে কূলে পৌঁছবার। হঠাৎ ভেজানো দুয়ারের ফাঁকে তেমনি একটি আলোর লাইন—আমাকে আশ্বাস দিল। দুয়ার খুলে বাইরে এলাম। বারান্দায় কমজোরী আলোটা জ্বলছে—পাশের ঘরে মানুষের কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হল।

মিতারই গলা শুনলাম, স্পষ্ট, নির্ভুল। তার সঙ্গে ব্রজনাথের গলা। নূতন আতঙ্কে—শিরায় শিরায় কাঁপুনি সুরু হল। টলে পড়ছিলাম—সামলে নিলাম কপাট ধরে। কপাট ঠকাস্ করে আছড়ে পড়ল দেয়ালের গায়ে।

মিতা এসে আমায় ধরল। তারই কাঁধে ভর দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। ব্রজনাথ ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। মিতা আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলো—শু—শু—

আমি চোখ চাইতেই ব্রজনাথ বলল, ভারি নার্ভাস তো আপনি। কোন খারাপ স্বপ্ন টপ্ন দেখেছিলেন বুঝি? না ভূতের ভয়?

মিতা বলল, কতক্ষণের জন্যই বা ও-ঘরে গিয়েছি—বড় জোর তিন মিনিট। তারই মধ্যে এত কাণ্ড! একেবারে খুকী তুই! কেন যে তোরা বাইরে বার হস!

ব্রজনাথ বলল, বলেন তো বারান্দায় একটা টুল টেনে নিয়ে বসি। রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এল।

না—না তুমি যাও, শোওগে। কাল বেড়াবার প্রোগ্রামটা মাটি করো না। মিতা তাড়াতাড়ি বলল।

ব্রজনাথ উঠল। মিতা বলল, তোমার ওষুধটা লেগেছে বোধ হচ্ছে—গলা জ্বালা আর টের পাচ্ছি না।

ব্রজনাথ বলল, ওষুধ আমি ভাল দোকান থেকেই কিনি—সস্তা দামের জিনিষ নয়।

দোর বন্ধ করে আলো নিভিয়ে আমার পাশে শুয়ে পড়ল মিতা। বলল, কি ভীতু রে তুই! ভদ্দর লোক কি মনে করলেন বল্ তো? পাড়াগাঁয়ের লোকেদের মনে নানান কুসংস্কার—ভূতের ভয়।

ততক্ষণে মনকে স্ববশে এনেছি। নৈতিক বলও ফিরে পেয়েছি। দৃঢ়স্বরে বললাম, এত রাত্রে ও-ঘরে কেন গিয়েছিলে মিতা?

ওই তো বললাম—দোকানের খাবার খেয়ে বোধ করি অম্বল হয়েছিল—বুক জ্বালা জ্বালা করছিল। তাই—

বললাম, না—তা নয়।

মিতা বলল, এ কথার মানে? ওর শুকনো গলার স্বরে বুঝলাম ভয় পেয়েছে।

বললাম, তিন মিনিটও তুমি ও-ঘরে যাওনি।

মিতা হঠাৎ উষ্ণ হয়ে বলল, দেখ শু, সব ছেলেমিরই একটা সীমা আছে। তুমি নিশ্চয় আমার গার্জেন নও!

বন্ধু বলেই জিজ্ঞাসা করছি।...

না বন্ধুরা এভাবে কৈফিয়ৎ চায় না। একটু থেমে বলল, যে মেয়ের মধ্যে নৈতিক বল নেই—তারাই এভাবে সন্দেহ করে অন্য মেয়েকে। অনাত্মীয় পুরুষ? হলই বা, মেয়েরা কি সাবানের ফেনা—যে একটু বাতাস লাগলেই ভেঙ্গে পড়ে!

বললাম, মিতা—কেন রাগ করছিস—আমি তো মন্দ ভেবে কিছু বলিনি।

মিতা ততক্ষণে বিছানায় উঠে বসেছে। হাঁপাচ্ছে উত্তেজনায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কাল যদি ব্রজনাথকে আমি বিয়ে করি—তাহলে তোমার সন্দেহ থাকবে কোথায়? যদি আমি ভালবাসি ব্রজনাথকে—কে আছে পৃথিবীতে যে এ মিলনে বাধা দিতে পারে? আমি খুকী নই—নিজের ভাল মন্দ বুঝি।

এ কথার কোন জবাব নেই। যদি কোন প্রত্যুত্তর করি—মিতার উত্তেজনা বাড়বে এবং উত্তেজনার বশে মিতা এমন কাজও করতে পারে যা কোনদিন ভাবতে পারিনি আমি। জানি না মিতা ব্রজনাথের বাগ্‌দত্তা কিনা? তাই যদি হয় তো এভাবে পরিবারহীন নির্জ্জন বাড়ীতে গভীর রাত্রিতে এত ছল চুতার আশ্রয় গ্রহণ করবে কেন ওরা? এই জালে আমিও যে জড়িয়ে পড়ছি ক্রমশঃ।

প্রভাত হল। মিতার মুখভার আর ঘুচল না। ব্রজনাথও কেমন গম্ভীরভাবে চলাফেরা করতে লাগল। মিতাকে উদ্দেশ করে বলল, মা কখন আসবেন জানি না, তোমরা কি হোটেলেই খাবে?

আমার আপত্তি নেই। মিতা উদাস স্বরে বলল।

মিস মিত্র—আপনি?

আমায় দয়া করে একবার বাবার আপিসে নিয়ে যাবেন? ওঁর পেনশন সম্বন্ধে—

ও—সেতো আজ হবে না। আজ আর কাল আমি ছুটি নিয়েছি আপিস থেকে। শরীর খারাপ হলে কি আপিস যাওয়া চলে! একটু থেমে বলল, হোটেলে খেতে আপনার আপত্তি নেই তো?

আপনার ভাঁড়ারে সবই তো মজুত—অনায়াসে তৈরী করে নেওয়া যাবে কিছু।

বেশ তো—বেশ তো—আমি তাহলে বাজার করে আনি। ব্রজনাথ উৎফুল্ল হয়ে বা'র হয়ে গেল।

মিতা আমার কাছে এসে আমার একখানি হাত টেনে নিয়ে বলল, রাগ করিস নে শু। এসেছি কলকাতা দেখতে—আমোদ আহ্লাদ করতে, মিছিমিছি মন খারাপ করে সব নষ্ট করে দিস নে।

ওর কাতর অনুনয় আমার মনটাকে নরম করে দিল। চোখের কোণে জল এল—গলা বন্ধ হয়ে গেল জমানো বাষ্পে। কোন মতে বললাম, না, রাগ করি নি।

বেশ চলল সারাদিন। চিড়িয়াখানার রাজ্যে এসে—মানুষের মনোজগতের খবর ভুলে গেলাম। প্রকৃতি আর পশুর সঙ্গ অনেক সময় মনের ক্ষত নিরাময় করে। মূক ও মৌন এরা—বাক্-বিভূতিতে মুগ্ধ করে না মন—আর্দ্রবায়ুর মত এদের ক্রিয়া—নিদাঘ দুপুরে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে যেমন মেদুর-পরিবেশে প্রসন্ন হয়ে ওঠে ধরণী।

অপরাহ্ণে চমৎকার ব্যাণ্ড বাজছিল—ঘাসের ওপর পা বিছিয়ে আমরা উপভোগ করলাম সেই সুর। একটা রেষ্টুরেণ্টে কিছু খেয়ে—সান্ধ্য-প্রদর্শনীতে এলাম মেট্রোয়। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত চমৎকার ঘর। কি জানি কেন—এখানে বসে গ্রামের কথাই খালি মনে পড়ছিল। পর্দ্দার গায়ে কি ছবি ফুটল—কেন করতালি ধ্বনিতে মুখরিত হল প্রেক্ষাগৃহ—কেনই বা উল্লাস উচ্ছ্বাস অগণিত দর্শকের—বুঝলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল, এ ছবি আমাদের জীবনের কথা বলে না, এ ছবি আমাদের রুচিকে পরিতৃপ্ত করে না—আমাদের রসবোধকে জাগ্রত করে না।

মিতা বলল, চমৎকার! সত্যিকারের জীবন উপভোগ করতে পারে ওরাই। সমাজের শাসন ওদের পঙ্গু করতে পারে না।

তার পরদিন গেলাম দক্ষিণেশ্বরে। অপরাহ্নে নদী পার হয়ে বেলুড়। বিস্তীর্ণ গঙ্গার জলে শান্ত অপরাহ্নের ছায়া—গঙ্গার কূলে এখানে ওখানে অতিকায় মিল—সুদৃশ্য মন্দির। দক্ষিণেশ্বরকে অনুকরণ করার চেষ্টা। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সাধক—

মিতা বলল, চমৎকার সিনারি! আচ্ছা এখানের ছবি উঠেছে কোন বইয়ে?

ব্রজনাথ বলল, উঠেছে বৈকি।

মন্দির দেখেও মিতা খুশী হল। বলল, দক্ষিণেশ্বরের চেয়ে এখানটা বেশ লাগছে। বেশ জমজমাট ভাব।

সন্ধ্যার পর নৌকা করে বাগবাজার ফিরলাম। সে দিনও ব্রজনাথের মা এসে পৌঁছুলেন না।

মনে করেছিলাম—আজ আর কোন চিন্তাকে ঠাঁই দেব না, আরাম করে ঘুম দেব। শরীর তো যথেষ্টই ক্লান্ত রয়েছে। কিন্তু কেমন অভ্যাস —রাত্রির মধ্যযামে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চারিদিকে অন্ধকার—পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে মিতা। ওর নিশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। গভীর নিদ্রার স্বপ্নহীন রাজ্যে ও চলে গেছে। আমার মনও চলে গেল কল্পনার রাজ্যে। কিন্তু কি কুৎসিত কল্পনা! এ চিন্তা কখনও তো করিনি। কাল রাত্রিতে ও ঘরে কি রহস্য সংঘটিত হয়েছিল—তার তত্ত্ব কেন অন্বেষণ করছে মন? কেন ব্রজনাথ আর মিতাকে নিয়ে আঁকছি একটি মিলনাত্মক চিত্র? মিতার হাসির ধ্বনি এসে কানে বাজছে—ব্রজনাথের অস্ফুট গম্ভীর কণ্ঠস্বর। মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে দামিনী-স্ফুরণ ও লঘুবর্ষণ। চ্যুতমুকুল গন্ধে আমোদিত প্রান্তর—মেঘভাঙ্গা জ্যোৎস্নায় সহকার

শাখায় প্রচ্ছন্নতনু কোকিলের ক্ষণ-বিরতিময় কুহুধ্বনি। আর মিতার সেই আবৃত্তি :

বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

আশ্চর্য্য, কুমারী মনের গভীরে কোথায় ছিল এই আবেশ-মধুর বসন্ত দিনের একটি মহূর্ত্ত। এই উত্তাপ আর অনুরাগ? এই অভিসার-উন্মুখ চিত্ত? পার্থিব শিবপূজা ক'রে যা কামনা করে কুমারী মেয়ে—সুন্দর তনু—ক্ষমাময়—প্রসন্ন চিত্ত—উদার আত্মভোলা পুরুষ। চিন্তায়, স্বপ্নে, কর্ম্মে ও বিশ্রামক্ষণে তাকে কামনার রঙে ও রেখায় সম্পূর্ণ করে নিতে থাকে প্রতিদিন। মিতাকে আশ্রয় করে আমি—আমিই তো বা'র হয়ে এসেছি আমার খোলস থেকে। সেই উগ্র কামনায় ছেয়ে গেছে চিত্তভুবন।

অস্ফুট চীৎকার করে চোখ বুজে ডুব দিলাম সেই অন্ধকার সমুদ্রে।

পরের দিনও ব্রজনাথের মা ফিরলেন না। যথারীতি রান্না খাওয়া সারা হলে ব্রজনাথ বলল, তৈরী হয়ে নাও মিতা—আজ অনেক দূরের পাল্লা।

মিতা বলল, শুয়ে পড়লি যে?

শরীরটা ভাল নেই—তোরা বেড়িয়ে আয়। আর দু'একবার অনুরোধ করে মিতা চলে গেল। সিঁড়িতে ওর লঘু পদক্ষেপ ও চটুল আলাপ কানে এল। বুঝলাম—ব্রজনাথকে একান্তে পেয়ে ও খুশীই হয়েছে।

ওদের সঙ্গে গেলাম না বটে, ওরা রইল আমার সঙ্গে। দূর পথে দীর্ঘ পরিক্রমায় আলোয় ছায়ায় ব্রজনাথ আর মিতা হাত ধরাধরি করে

চলল। ওদের কল-গুঞ্জনে আচ্ছন্ন হল শ্রুতি।...মনের রথে দৃষ্টি আর শ্রুতি দুই বেগবান অশ্বকে জুড়ে দিয়ে সুরু হল আমার বিশ্বভ্রমণ।

অনেক রাত্রিতে ফিরল ওরা। বলল, রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে এসেছে। অত্যন্ত ক্লান্ত—একটু ঘুমোতে চাইল।

আশ্চর্য্য, আজও ঘুম ভেঙ্গে গেল মাঝরাতে।...বাইরে নিস্তব্ধ পৃথিবী—ঘরে অন্ধকার।

পাশে অভ্যাসমত হাত দিয়ে অনুভব করতে চাইলাম মিতার সান্নিধ্য। ছ্যাং করে উঠল বুকের মধ্যে। মিতা নাই। মাথার মধ্যে রক্ত উঠল চন্ চন্ করে। কি করব---কি করব আমি? এতো মিতার অভিসার নয়-তবে আমারই মৃত্যু। মনের মাঝে শিহরণ—উত্তেজনা—আবেশ উন্মাদনা। না, না, কালই পালাব এখান থেকে। এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব আমি ফিরে যেতে পারব না আমাদের ঘরে।

মিতা ফিরে এল। সন্তর্পণে দুয়ার বন্ধ করল। শুয়ে পড়ল সন্তর্পণে। আস্তে আস্তে একখানি হাত দিয়ে আমায় স্পর্শ করল। নিঃসংশয় হল আমি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি।

সকালে উঠে বললাম, আজ বাবার আপিসে নিয়ে যাবেন আমাকে? দরখাস্ত দিয়েই আমি চলে যাব বাড়ী।

থাকবেন না আর দুটো দিন? কাল তো দেখলেন না কিছুই। ব্রজনাথ বলল।

না—ভাল লাগছে না। বাবা হয়তো কত ভাবছেন।

কে বলেছে আপনাকে? আর তিনি তো দেশে নেই—চেঞ্জে গেছেন রাজগীরে।

চেঞ্জে গেছেন? হঠাৎ?

কাল অনুপমের চিঠি পেলাম। এই দেখুন। ওতো লিখছে—ওখানকার কে ডাক্তারবাবু—তিনি জোর করে ওঁকে নিয়ে গেছেন। বলেছেন—Hot water spring-এ মাসখানেক ধরে স্নান করলে বাত আরাম হয়ে যাবে। এর পর তিনি চাকরি করতে পারবেন—ইনভ্যালিড পেনসন নিতে হবে না। অনুপমও ওঁদের সঙ্গে গেছে কিনা তাই আরও এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছে সে।

চিঠিতে এর বেশী কিছু ছিল না। তবু বিশ্বাস হল না ব্রজনাথের কথা। মনে হল—আমার চারিদিকে যেন ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হচ্ছে। মিতা পর্য্যন্ত সেই জালের বুননের কাজ করছে। মাত্র চারদিন হল দেশ ছেড়ে এসেছি—এর মধ্যে·····? না, না, আমাকে ফিরতেই হবে।

আজও ব্রজনাথের মা ফিরলেন না। জানি, কোনও দিনই উনি ফিরবেন না। অন্ততঃ আমরা যতদিন এখানে থাকব। আশ্চর্য্য, একেই বিশ্বাস করেছে মিতা—একেই ভালবেসেছে?

আজও ওদের সঙ্গে গেলাম না বেড়াতে। আজ সঙ্কল্প করেছি—পালাব এখান থেকে। কোন মতে পথ চিনে পৌঁছতে পারব না কি ষ্টেশনে? একখানি টিকেট কিনে চাপতে পারব না কি দেশের গাড়ীতে? দেখা যাক কি হয়।

ওরা চলে গেলে তৈরী হয়ে নিলাম। আমার ভাল শাড়ীটা রয়েছে মিতার স্নুটকেশে—চাবি বন্ধ। থাক। টাকা? সেও হয়তো সুটকেশে আছে। কিংবা ব্রজনাথের পকেটে। টেবিলের উপর মাত্র দু'টো আনি রয়েছে। ওতে বড় জোর ট্রামে করে হাওড়া পৌঁছুতে পারব। তারপর? যাই হোক অদৃষ্টে—এখানে আর

মুহূর্ত্তমাত্র থাকব না। এখানে থাকলে কোন কালেই ফিরে যেতে পারব না দেশে।

বেশী উত্তেজনায় বিবেচনাশক্তি লোপ পায়। আমারও তাই হল। বাগবাজার থেকে ট্রামে চেপে যেখানে পৌঁছলাম—সেটি হাওড়া ষ্টেশন নয়। একটা বড় পুকুর ঘিরে খানিকটা বাগান। তার চারধারে ট্রাম লাইন—আর বড় বড় ইমারৎ। এ পথে যেমন গাড়ীর ভীড়—তেমনি মানুষের চাপ। পথের এধার থেকে ওধারে যাওয়া রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কন্‌ডাক্‌টার বলল, ট্রামের যাত্রা শেষ হল—ট্রাম ফের যাবে বাগবাজারে। নামবেন কি?

নামলাম। কিন্তু কোথায় যাব? পথ পার হওয়ার চেয়ে পুকুর-ধারে গাছের ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নিই। সেই ভাল—ওখানে বসেই হাওড়া যাওয়ার পথটা ঠিক করে নেব।

কতকগুলি গাম জাতীয় গাছ মিলে ঘন ছায়া বিস্তার করেছে এক জায়গায়। গাছের উপর গোটা কয়েক কাক বসে আছে—নীচেয় কেউ নেই। গিয়ে বসলাম তার ছায়ায়। আর বসতেই শিরশিরে হাওয়ায় দেহটা জুড়িয়ে গেল। উত্তেজনা হ্রাস হতেই আলস্যে ঝিমিয়ে এল দেহ—দু'টি চোখ জুড়ে নামলো ঘুমের বন্যা। কখন যে তলিয়ে গেলাম—তার টানে...

চোখ চেয়ে দেখি—চারদিকে কোমল আলো—দীঘির জলে রোদ চিক্ চিক্ করছে না। রাজপথে মানুষের স্রোত উত্তাল হয়ে উঠেছে—এবং দীঘির পাড়ের পথ বেয়েও চলেছে মানুষ। ছুটি হল কি আপিসের? ঘরে ফিরে চলেছে এরা? ঘর? হু-হু করে দু'চোখ ছাপিয়ে জল নেমে এল। কোথায় আমার ঘর? কেমন করে

পৌঁছব সেখানে? অকরুণ রাজধানীতে কে দেবে আমাকে আশ্রয় এবং আশ্বাস?

বেলা শেষ হয়ে আসছে—পথের ধারে ঝাঁকড়া গাছটায় ফিরে আসছে পাখীর ঝাঁক। কাকেরা সুরু করেছে কোলাহল। দিনের সুরুতে আহার অন্বেষণে যারা দিকদিগন্তরে ছুটেছিল—দিনান্তে তারা একই আশ্রয়ে এসে মিলছে। পাখীর জগতে এই মিলনের মূল্য কতটুকু! সুখ দুঃখ বেদনা আনন্দ ওদের কতখানি বিচলিত করতে পারে?

কিন্তু তবু ওরা সুখী—ওরা সুখী। ওরা ঘরে ফিরল—প্রিয় পরিজনের সঙ্গে মিশল, বিচ্ছেদভারাতুর দীর্ঘ দিনের দুঃসহ প্রতীক্ষা শেষ হল ওদের। আর আমি! দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। যত চেষ্টা করি কান্না চাপতে—ততই দুর্ণিবার বেগে ঠেলে ঠেলে ওঠে কান্নার সমুদ্র। সে সমুদ্র উত্তীর্ণ হব এমন সাধ্য আমার নেই।

[ক্রমশঃ]

—"সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজ-বিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্ম্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকার-ভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

ফাঁদ

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

ভেবে চিন্তে বলো, রাজি আছো কিনা। তাহলে এখন থেকেই কাজে লেগে যাই। এতো বড় একটা সরকারি অর্ডার একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে পস্তাতে হবে বলে রাখছি।

তুমি এখনই অর্ডার দেখছো কোথায় ভায়া? সবেমাত্র তো সুপারিশ!—ছোট বেলার সহপাঠী ভবেশ পাঠকের উন্মাদনাকে এই বলে খানিক দমিয়ে দিয়ে সত্যি সত্যি একটু ভাবতে লেগে যান নির্মলেন্দু রায়।

১৯৩০ সাল। বিশ্বব্যাপী মন্দার বাজার। পাটের চাহিদা নেই। অভাবনীয় কম দরেও ক্রেতা মেলে না। অন্যান্য জিনিষপত্রের মূল্যও অস্বাভাবিক কম। চাষী আর ব্যবসায়ী মহলে রীতিমত হাহাকার।

মূলধনের অঙ্ককে অনেক দূর ছাপিয়ে উঠেছে দেনার পরিমাণ। কী ভাবে যে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে সে প্রশ্নই আলোড়িত করছিল নির্মলেন্দুর মনকে। এর আগেও অনেক বিপদ এসেছে। কিন্তু দমকা হাওয়ার মতো এক একটা সুযোগও এসেছে। বিপদও কেটে গেছে। কিন্তু এবার যে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার মতো সুযোগ সুবিধে কি একটা কিছু আসবে না!

সকাল বেলার চায়ের টেবিলে বসে চা খেতে খেতেই রায় ভাবছিলেন এসব কথা। চায়ের কাপের ধোঁয়ার মতোই নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল তাঁর মাথায়। ঠিক তেমনি সময়েই পাঠকের আবির্ভাব। ভালো খবর নিয়েই পাঠক আসেন। কাজেই রায় কিছুটা আশ্বস্ত

বোধ করেন তাঁকে দেখে। কিন্তু ইয়োরোপীয় পোষাক পরিহিত অপর ভদ্রলোকটি কে?

ইনি মিঃ সেন। ফরিদপুরে আমাদের স্কুলেই পড়তেন। অবশ্যি আমাদের অনেক আগেই তিনি ফরিদপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছেন। আমরা তখন স্কুলে ভর্তিও হইনি। এই বলে নির্মলেন্দুর সঙ্গে পাঠক পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর সঙ্গীকে।

ফরিদপুর স্কুল থেকে কোন্ বছর পাশ করেছেন আপনি?

আমি এণ্ট্রান্স পাশ করেছি ১৯০৮ সালে।

ও, তাহলে তো দেখছি, আমি যখন ফরিদপুর স্কুল ছেড়ে এসেছি তখন আপনি একদম ছেলেমানুষ! —প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে কথায় কথায় সেন বলেন নির্মলেন্দুকে।

পুরোনো কথা থাক এখন।—পাঠক ব্যস্তবাগীশ মানুষ। অতীত কাহিনীর আলোচনা থামিয়ে দেন।

হ্যাঁ, আজকের অভিযানের উদ্দেশ্যটাই খুলে বলো না। আমিও তা জানবার জন্যেই ব্যস্ত।—এই বলে পাঠককে তার মূল বক্তব্য পেশ করার সুবিধে করে দিয়ে নির্মলেন্দু হুকুম করেন জগন্নাথকে চা ও খাবার নিয়ে আসতে অতিথিদের জন্যে।

বলুন মিঃ সেন, সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে আপনিই বলুন নির্মলেন্দুকে।

বিষয় আর কি, ও তো সোজাসুজি কথা। একটা কণ্ট্রাক্ট-এর ব্যাপার।—বলেন মিঃ সেন।

কিসের কণ্ট্রাক্ট?

চাল সাপ্লাইয়ের।

একেবারে সরকারি ব্যাপার মশাই। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অর্ডার।

কোন ঝকমারির কাজ-কারবারের মধ্যে আমি নেই। সব কিছুই ঠিক। এখন দরকার কিছু টাকার।—এই বলে মিঃ সেন তাঁর কোটের ভেতরের পকেট থেকে একখানা খামের চিঠি বার করে দেন নির্মলেন্দুর হাতে। কিন্তু চিঠিখানা বার করে দিয়েই যে তিনি থেমে যান তা নয়। তাঁর বক্তব্য পুরোদমেই চলতে থাকে।

কি আর বলবো মিঃ রায়, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের জেল ডিপার্টমেণ্টের বড় সায়েবরা যে কতোটা স্নেহ করেন আমায় তা ভাবতে পারবেন না আপনি। যে ভাষায় এবং যেভাবে আমায় চিঠিপত্র লেখেন ওঁরা তাতে সত্যি সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু হঠাৎ এই জেল ডিপার্টমেণ্টের সায়েবদের সঙ্গে আপনার এতোটা ভাব কি করে হলো মিঃ সেন?—চিঠিখানা পড়তে পড়তেই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন নির্মলেন্দু।

আরে মশাই, সে আর কতো বলবো। অনেক মজার মজার কথা আছে। ঘটনাচক্রে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস্ মিঃ সিম্পসনের সঙ্গে একবার আলাপ হলো, আর সেই থেকে ভদ্রলোক যে আমায় কী চোখেই দেখলেন তা আর বলতে পারি না। আমার যে কোন বিপদে তিনিই রক্ষাকর্তা। আমাকে সাহায্য করতে পারলে তাঁর আনন্দের যেন সীমা থাকে না। তাঁর মারফতেই আর সবার সঙ্গে আলাপ পরিচয়।

হ্যাঁ, তাইতো দেখছি। কিন্তু এখানে অর্ডার কোথায়? এ তো ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আর এক সায়েবের কাছে একটা সুপারিশ পত্র। আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে মিঃ সিম্পসন অনুরোধ করেছেন ঐ সায়েবকে।

কিন্তু জানেন মিঃ রায়, ঐ সায়েবের কাছ থেকে টাকা সাহায্য

নিলে তাঁকেই তো লাভের একটা বড়ো অংশ দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আমার সে ইচ্ছে নেই।

এ কি বলছেন আপনি মিঃ সেন? দশ পনেরো হাজার মণ চা'লের টাকা, সে তো বড়ো চারটিখানি কথা নয়। সে টাকাটা যিনিই আপনাকে দিন না কেন লাভের একটা মোটা অংশ তাঁকে তো দিতেই হবে।

তাহলেও একটা বিদেশীকে আর দিতে যাবো কেন, যদি দেশের কোন লোককে নিয়ে কাজটা হাসিল করা যায়। মিঃ পাঠক তাইতো আমাকে নিয়ে এলেন আপনার কাছে।

বেশ ভালো কথা। তবে একটা বিষয় আপনাকে পরিষ্কার করেই বলে দেওয়া ভালো মিঃ সেন। যে অর্ডার এখনো হাতে আসেনি, তেমন কোন অডার যোগাড় করার জন্যে টাকা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

না, না, এখুনি আপনাকে টাকা দিতে হবে না মিঃ রায়। অডার যোগাড় করে আনতে পারলেই আপনার কাছে টাকা চাইবো। আর তাও লাভের অঙ্কের সিকি পরিমাণ টাকাই অগ্রিম নেবো আপনার কাছ থেকে।

তা বেশ, তাতে খুব আপত্তি নেই আমার।

হ্যাঁ, আমার সঙ্গেও মিঃ সেনের এমনি কথাই হয়েছিল। তাইতো তোমার কাছে নিয়ে এলাম কথাপ্রসঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা মিঃ সেনের কাছে শুনতে পেয়ে।

বেশ করেছো ভায়া। কিন্তু ভবেশ, তুমি মিঃ সেনকে পাকড়াও করলে কি করে? তোমার সঙ্গে আগেই চেনা জানা ছিল নাকি? কই, কোনো দিনও তো বলোনি মিঃ সেনের কথা। না, হালে

পার্টনারশিপ বিজনেস আরম্ভ করেছ সেনের সঙ্গে। তাহলেও তো আমাকে এ কথাটা এদ্দিন না জানাবার কারণ দেখছি না কিছু।

আরে দুর পাগল। ও সব কি আজে বাজে কথা বলছো? মিঃ সেন মাত্র ক'দিন আগেই আমাদের মেসে এসে উঠেছেন। আমার পাশেই সিঙ্গল সিটেড রুমে থাকেন। সেই থেকেই আলাপ পরিচয়। একেবারে স্কুল জীবনের কথা পর্যন্ত জানাজানি।

ও, এই ব্যাপার! বেশ, চা-টা খেয়ে নাও এবার। এই নিন মিঃ সেন।—জগদীশ চা-সহ জলযোগের ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতেই অতিথি সৎকারে উদ্যোগী হন নির্মলেন্দু।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও সামনে আর এক কাপ চা ও এক প্লেট খাবার এসে হাজির হয়।

জলযোগ শেষে বিদায় নেবার আগে নির্মলেন্দুকে পাশের ঘরে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে যান ভবেশ পাঠক।

এ ট্রান্‌জ্যাকশনটা সাকসেস্‌ফুল হলে তোমারও ভাই পকেটে বেশ কিছু আসবে, আমারও যৎকিঞ্চিৎ হবে।

তাই বলো ভায়া, তাই বলো। এ যে একেবারে নিছক বন্ধুকৃত্যের ব্যাপার নয় তা আমারও মনে হয়েছে। - পাঠকের কথায় নির্মলেন্দু হেসে ফেলেন এই বলে।

হাসির কি আছে ভাই এতে? দালালী করে পেট চালাই, এ তো আর তোমার অজানা নয়। আর তোমার কাছেও যে আমি এই প্রথম কেস নিয়ে এসেছি তাও তো নয়। তবে এ কেসটা একদম জানা পরিচয়ের মধ্যে, একেবারে সরকারি কারবার। পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে টাকা ফেলা যায় এতে। তাই তো তোমাকে এতোটা মন খুলে বলতে পারছি।

বেশ, আর বক্তৃতার দরকার নেই। যা করার করা যাবে'খন। চলো, ভদ্রলোক একা বসে আছেন। কি মনে করছেন হয়তো!

না, কি আবার মনে করবেন। তুমি টাকা ঠিক রাখবে। দরকার মতো চাওয়া মাত্রই যেন পাওয়া যায়।—এই বলে পাঠক ছুটে যান মিঃ সেনের কাছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ দোতলা থেকে রায়-গিন্নী হাঁক ছাড়েন—জবা!

কেন মা?

সাড়ে আটটায় তোর বাবার না কোথায় যাবার কথা ছিল?

আরে ঠিক, আটটা তো বেজে গেছে!

গৃহিণীর কথা শুনে চমকে ওঠেন রায়। দাঁড়িয়ে পড়েন চেয়ার ছেড়ে।

আচ্ছা, যাই তা'হলে।—নির্মলেন্দুকে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে একরকম নিশ্চিন্ত হয়েই বিদায় নেন মিঃ সেন। তাঁরাও বুঝতে পারেন যে এতোক্ষণ ধরে রায়কে আটক করে রাখায় গৃহকর্ত্রী হয় তো বিরক্ত হয়েছেন। তবে ডায়েরী অনুযায়ী কাজের কথা কর্তাকে মনে করিয়ে দেওয়ায় গৃহকর্ত্রীর তারিফও করেন মিঃ সেন।

হ্যাঁ, আধুনিক স্ত্রীর এসব দিকে নজর রাখতে হয় বৈকি।—বলেন ভবেশবাবু।

* * *

এরপর মিঃ সেনকে নিয়ে ভবেশ পাঠক প্রায়ই আসেন নির্মলেন্দুর বাড়িতে। খবরের কাগজে টেণ্ডার আহ্বান করে কয়েকদিন পর পরই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে জেল দপ্তর থেকে চা'লের কনট্রাক্ট-এর জন্যে।

মিঃ সেন সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই রায় তাঁকে জানিয়ে দেন যে

তাঁর সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারেনি সে বিজ্ঞাপন। কারণ খবরের কাগজের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ রয়েছে।

শুধু টেণ্ডার সই করাতেই নয়, নির্মলেন্দুর ব্যবসায়ের পরিচিতি, তাঁর বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হিসেব, তাঁর ফার্মের কোথায় কোথায় শাখা রয়েছে তার বিবরণ, কতো ইন্‌কাম ট্যাক্স দিতে হয় তাঁকে তার পরিমাণ ইত্যাদি নানা বিষয় জেনে নেবার জন্যেও রায়ের কাছে বার বার আসতে হয়েছে সেন আর পাঠককে। প্রত্যেকটি টেণ্ডারের দরখাস্তের সঙ্গেই যে এ সব বিবরণের উল্লেখ করতে হবে! নির্মলেন্দুর টাকাতেই শুধু নয়, তাঁর ফার্মের নামেই এ কন্‌ট্রাক্ট করা হবে, তাঁকে বিশেষভাবে নিশ্চিন্ত করবার জন্যে এ কথাটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আর কন্‌ট্রাক্ট পাবার জন্যে কি পরিমাণ যে তদ্বির করতে হচ্ছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে কথা শোনাতেও মিঃ সেনের ভুল হয় না। সায়েবদের ভেট দিয়ে দিয়ে এর মধ্যে যে সেন অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছেন তাও পাঠকের মুখ দিয়ে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখা হয়েছিলো। কিন্তু এতো সত্ত্বেও নির্মলেন্দু তাঁর আগের কথায় একেবারে অনড়। কন্‌ট্রাক্ট না দেখে একটি কাণাকড়িও তিনি ঘর থেকে বার করতে পারবেন না, এ কথা প্রতিদিনই পরিষ্কার করে সেন ও পাঠককে জানিয়ে দিতে তাঁর একটুও কুণ্ঠা হয় নি।

বরং রায় তাঁদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, জেলে মাল সরবরাহের কোন অভিজ্ঞতাই তাঁর নেই, কাজেই তাঁর ফার্মের নামে কন্‌ট্রাক্ট যোগাড় করা কঠিনই হবে। কিন্তু সে কথা মিঃ সেন কিছুতেই মানতে রাজি হন নি। তবে কন্‌ট্রাক্ট পাবার আগে যে একটি পয়সাও তিনি আগাম চান না, এ প্রতিশ্রুতি তিনি প্রতিবারেই দিয়ে এসেছেন।

বাড়িতে ফিরতে ঘণ্টা কয়েক দেরী হবে, এ কথাটা সেদিন রায়

বলেই গিয়েছিলেন। কন্যা জবাকে এ ও বলে গিয়েছিলেন যে, বিশেষ জরুরী ব্যাপারে এ সময়ের মধ্যে যাঁরা আসবেন সে যেন তাঁদের একটু অপেক্ষা করতে বলে। আর যাঁদের পক্ষে তা সম্ভব হবে না তাঁদের নাম যেন সে জিজ্ঞেস করে রাখে।

রায় সাধারণতঃ সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যেই ঘরে ফিরে আসেন। সেদিন যেন কোন্ একটা কটন মিলের ডিরেক্টার বোর্ডের মিটিং থাকায় বাইরে একটু আটকে পড়েছেন। কখন তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যায় না যায় তার কিছুই অজানা নেই ছোটবেলার বন্ধু ভবেশ পাঠকের। কিন্তু সেদিন যে বাড়ি ফিরতে দেরী হবে সে খবরটা তার জানা ছিলনা, তাই মিঃ সেনকে নিয়ে সন্ধ্যার পর যেয়ে উপস্থিত হয়েছেন রায়ের বাড়িতে।

কলিং বেলের আওয়াজ পেয়েই তার গান থামিয়ে সদর দরজায় ছুটে আসে জবা। ভারি সুন্দর টুকটুকে মেয়ে। ছুটে এসেই বলে—

বাবার আসতে আজ দেরী হবে।

কতো দেরী হবে ?

বাবা বলেছেন দেড় ঘণ্টার মতো। আটটার মধ্যে এসে পড়বেন।

বেশ, তা'হলে বসাই যাক খানিকক্ষণ। সাড়ে সাতটা তো বাজে প্রায় —বুকপকেট থেকে ঘড়িটা বার করে দেখে নিয়ে বলেন ভবেশ পাঠক।

বেশ তো, আসুন তা'হলে। ভেতরে এসে বৈঠকখানায় বসুন। বাবা এসে পড়বেন এরই মধ্যে। জবা পাঠক কাকা ও মিঃ সেনকে এই বলে নিয়ে আসে বৈঠকখানায়।

তুমিই গান গাইছিলে বুঝি—তোমারি ভুবন হ'তে তোমায় শোনাই

গান। যেমনি সুন্দর গানের কথা, তেমনি মিষ্টি সুর। পাঠক প্রশ্ন করেন জবাকে।

হ্যাঁ, কাকাবাবু, আমিই গাইছিলাম।—জবা উত্তর দেয়।

আচ্ছা মা, জগন্নাথকে একটু ডেকে দাও দেখি।

কেন, চা চাই? আমিই এনে দিচ্ছি। জগন্নাথকে একটু বাইরে পাঠিয়েছেন মা লক্ষ্মীব্রতের কি সব জিনিস-পত্তর কিনতে। আজ বৃহস্পতিবার কিনা! বসুন একটু, চা আমি এখুনি তৈরী করে নিয়ে আসছি।

শুধু তো চা-ই নয় মা, এক প্যাকেট সিগারেটও আনতে হবে। তার জন্যেই চাইছিলাম জগন্নাথকে। চায়ের কথা তো তোমার জানাই আছে মা, তা আর বলে দিতে হবে না জানি। তোমার এই কাকাবাবু এলেই প্রথম কথাই তো হলো চা। কিন্তু এখন বেশি তাগিদ হলো ধূমপানের। তা হোক, জগন্নাথ এলেই ব্যবস্থা হবে'খন। তুমি চা-টাই আগে খাওয়াও দেখি। —একথা বলতে বলতে পকেট থেকে একটা শূন্য প্যাকেট পাঠক জবার চোখের সামনেই ছুঁড়ে ফেলে দেন উঠোনের দিকে।

সিগারেটও আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি কাকাবাবু!—এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে জবা দোতলা থেকে তার বাবার গোল্ডফ্লেকের কৌটোটা নিয়ে এসে বৈঠকখানার টেবিলের উপর রেখে দিয়ে যায়। একটা দেশলাই-এর বাক্সও।

ভারি সুন্দর চটপটে মেয়ে তো? মিঃ রায়েরই মেয়ে বুঝি?

হ্যাঁ, মাত্র নয় দশ বছরের মেয়েকে কেমন চমৎকার করেই না গড়ে তুলেছে তার বাপ মা!—মিঃ সেনের প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে পাঠকজী

মেয়ের চাইতে তার বাপ মায়েরই প্রশংসা করে ফেলেন বেশি। তবে এ প্রশংসা তাদের যথার্থ প্রাপ্য বৈকি!

হ্যালো পাঠক! নমস্কার মিঃ সেন, বসুন বসুন। কতোক্ষণ এসেছেন আপনারা? আমার একটু দেরী হয়ে গেল আজ। মনে কিছু করবেন না যেন! কোন অসুবিধে হয় নি তো আপনাদের?

আরে না না, কী অসুবিধে হবে আর? ঐটুকু মেয়েকে যে ভাবে তৈরী করেছেন আপনি, তাতে অতিথি সংকারে কোন ত্রুটি হ'তে পারে কখনো?—কেকের না-খাওয়া অংশটুকু প্লেটে নামিয়ে রাখতে রাখতে মিঃ সেন জবাব দেন রায়ের কথার।

তুমি ভায়া হাত মুখটা ধুয়ে একটু সুস্থ হয়ে এসো। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়। আমরা ততক্ষণে আমাদের চা-পর্বটা সেরে নি। দেখতেই তো পাচ্ছ জবা মা কি সুন্দর চা পরিবেশন করে গেছে আমাদের জন্যে।—পাঠক বলেন।

এমনি গুছিয়ে কাজ করেছে খুকু!—বিস্ময় প্রকাশ করেন নির্মলেন্দু।

আরে শুধু কি এই দেখছো তুমি? আরো অনেক কাজ সে করছে। সব শুনবে। তা ছাড়া অনেক জোর খবর আছে। তাড়াতাড়ি চলে এসো। জোর খবর আছে বলেই তো তোমার জন্যে এতোক্ষণ বসে থাকা। যাও, যাও আর দেরী করোনা ভায়া। পাঠক এই বলে-অন্দর মহলে পাঠিয়ে দেন রায়কে।

জেলের কন্ট্রাক্টটা হয়তো পাকাপাকি হয়ে গিয়ে থাকবে এবার। ওদের এতোটা উৎফুল্ল দেখে এই ধারণা হয় নির্মলেন্দুর। লাভের অঙ্কটা যদি তেমন ভাল না দাঁড়ায় তাহলে বেশী টাকার রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে কিনা সেটাই হলো ভাববার কথা। আপন কল্পনাকে কেন্দ্র করে রায়ের

মনের ভাবনাগুলো ঘুরতে থাকে বিচ্ছিন্নভাবে। তবে সরকারি কন্ট্রাক্ট এই যা সুবিধে। এই ভেবে রায় নিষ্কৃতি পেতে চান চিন্তার হাত থেকে।

বলুন এবার মিঃ সেন। কতদূর কি হলো আপনার সরকারি কণ্ট্রাক্টের।

অল্প সময়ের মধ্যেই নির্মলেন্দু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বৈকালিক আহার সেরে ফিরে আসেন অন্দরমহল থেকে এবং এসেই সরাসরি প্রশ্ন করে বসেন সেনকে। মিঃ সেনও মোটেই অপ্রস্তুত হবার পাত্র নন তাতে।

এই যে দেখুন মিঃ রায়। এই বলে পকেট থেকে মিঃ সেন একটা অফিসিয়াল অর্ডার বার করে দেন নির্মলেন্দুর হাতে।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল কর্তৃপক্ষেরই অর্ডার। খুব মন দিয়েই রায় অর্ডার-পত্রটি পড়ে নেন। দশ হাজার মণ চাল সরবরাহ করতে হবে আলিপুর জেলে। একি সহজ ব্যাপার! তবে সাপ্লাই দিয়ে উঠতে পারলে লাভও প্রচুর। চট্ করে একবার ভেবে নিলেন নির্মলেন্দু।

চা'লের বাজার দর যখন মণপ্রতি চার টাকা সোয়া চার টাকা, তখন জেল কর্তৃপক্ষ সাড়ে ছ' টাকার দরে টেণ্ডার গ্রহণ করেছেন, এতো বেশ ভালোই একটা সুযোগ। সেনের তাহলে নিশ্চয়ই জেল কর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তা না হলে এতো তাড়াতাড়ি এতো বড় একটা অর্ডার সরকারি দপ্তরখানা থেকে বার করে আনা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

হঠাৎ কেমন একটা খটকা লাগে রায়ের মনে। সব ঠিক আছে তো! অর্ডারটা আর একবার উল্টে পাল্টে দেখেন তিনি! জেলের ছাপানো ফর্মে টাইপ করা অর্ডার। নীচে ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্ট

আই-এম-এস—জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্বাক্ষর। না, সন্দেহ করার নেই কিছু।

কী এতো ভাবছেন মিঃ রায়? সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়েও আমাদের নীট লাভ হবে বিশ হাজার টাকা। মাল যখন যেমন ডেলি-ভারি দেবো, তখনি তার দাম মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর ঐ লাভের টাকা নিয়েই আবার নতুন মাল খরিদ করে সাপ্লাই দেবো। কাজেই ভাববার আর কি থাকতে পারে?

না তা' হলে তো আর ভাববার কিছুই নেই দেখছি। আমার চিন্তা হচ্ছিল, একবারে দশ হাজার মণ চা'ল খরিদ করার মত টাকা জোগাড় করা যাবে কোত্থেকে। তবে কাজটা করে দিতে পারলে যে নীট বিশ হাজার টাকা লাভ হবে সে কথাটাও ভাবছিলাম।

তাই তো মিঃ রায়, এমন একটা অর্ডারকে কিছুতেই হাতছাড়া করা চলে না! পাঁচ হাজার টাকা নগদ পেলেই আমি কাজটা চালিয়ে দিতে পারবো। আজই আপনি সে টাকাটা আমায় দিন। আপনাকে লাভের আধাআধি দিতেও আমার আপত্তি হবে না। একেবারে লেখা-পড়া করেই আপনি টাকা নেবেন।

ব্যস্, এর চেয়ে আর ভালো টারমস্ কী হতে পারে? দাও ভায়া টাকাটা আজই দিয়ে দাও। কালই ফার্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট ডেলিভারি দেওয়া যাবে। কি বলেন মিঃ সেন?—ছুজনকে লক্ষ্য করেই এভাবে কথা বলেন পাঠক।

আরে কি পাগল, এক্ষুনি আমি পাঁচ হাজার টাকা পাবো কোথায়? ঘরে কি এতোগুলো নগদ টাকা কেউ ফেলে রাখে কখনো?

ব্যবসায়ী মানুষ তোমরা। যখন তখন টাকার আমদানী হয়

তোমাদের। কাজেই থাকতেও তো পারে।—বন্ধুর কথার জবাব দেন পাঠক।

না ভাই নেই, সত্যি বলছি। কাল ব্যাঙ্ক খুললেই আমি চেক কেটে টাকা তুলে আনবো। মিঃ সেন আপনি কাল দুপুর বেলা ১টা থেকে ২টার মধ্যে আমার ক্লাইভ ষ্ট্রীটের অফিসে গেলেই টাকাটা পেয়ে যাবেন।

বেশ, বেশ তাই হবে। চা'ল খরিদের ব্যবস্থাটা এখুনি যেয়ে পাকাপাকি করে ফেলি। সুন্দরলালের সঙ্গে আমার মোটামুটি কথা তো হয়েই আছে। চলুন ভবেশবাবু, চলুন। নমস্কার!—আর কথা না বাড়িয়ে নির্মলেন্দুকে নমস্কার জানিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়েন মিঃ সেন।

একটা দিন দেরী হয়ে গেলেও অর্ডারটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এই আশঙ্কায়ই হয়তো এতো তাড়া। নির্মলেন্দু এভাবে মনে মনে মিঃ সেনের তাড়া-হুড়োর ব্যাখ্যা করেন। সে যা হয় হোক গে, পাঁচ হাজার টাকা লোন দিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে দশ হাজার টাকার বেনিফিট পাওয়া এই মন্দার দিনে বড়ো কম কথা নয়। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত। নির্মলেন্দুর চোখ মুখ খুশিতে উজ্জল হয়ে ওঠে এই ভাবতে ভাবতে। ভগবানকে ধন্যবাদ জানান তিনি তাঁর এই আকস্মিক করুণার জন্যে।

* * *

পরের দিনের কথা। ব্যাঙ্কের কাজ সুরু হতে না হতেই রায় তাঁর ব্যাঙ্কে যেয়ে উপস্থিত। ক্লাইভ ষ্ট্রীটেই তাঁর ব্যাঙ্ক। একেবারে তাঁর নিজের অফিসের মুখোমুখিই বলা চলে। পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক কেটে দিতেই ম্যানেজার জানালেন ঘণ্টাখানেক দেরী হবে

পেমেন্টটা রেডি করতে। বেশি টাকার ব্যাপার কিনা তাই। সবটা গুছিয়ে দিয়ে নির্মলেন্দুবাবুকে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হবে তাঁর অফিসে। ম্যানেজার সে আশ্বাসও দিলেন।

কাজেই আর অনর্থক ব্যাঙ্কে বসে থেকে লাভ কি? তাঁর অফিসেও এখন তেমন কোন জরুরী কাজ নেই। আচ্ছা, এই অবসরে একটু খোঁজ খবর নিলে হয়না? তরাক করে একটা চিন্তার তরংগ খেলে যায় নির্মলেন্দুর মাথায়।

আচ্ছা, কাছেই তো রাইটার্স বিল্ডিংস। পাঁচ হাজার টাকা পরের হাতে তুলে দেওয়ার আগে জেল বিভাগের কর্তাদের কাছে একটু ঘুরেই আসা যাক না! কথাটা মাথায় আসতেই নির্মলেন্দু ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়েই সটান চলে আসেন লালদীঘির মহাফেজখানায়।

জেল দপ্তরের ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্ণেল সিম্পসনের (স্বর্গত বিপ্লবী বিনয় বসুর গুলীতে যিনি মাত্র কয়েক মাস পরে নিহত হয়েছিলেন তাঁর নিজ দপ্তরে) পার্শনাল এ্যাসিষ্টেন্ট রায় বাহাদুর জ্ঞানচন্দ্র গুহ নির্মলেন্দুর পরিচিত। আত্মীয়তার একটা সূত্রও রয়েছে তাঁর সঙ্গে। কাজেই তিনি কোন কিছু গোপন করবেন এ হতে পারে না। তাছাড়া অর্ডারটা যদি ঠিকও হয় তাহলেও জেলখানায় মাল সরবরাহের নিয়ম-কানুনগুলো তো জেনে নেওয়া যাবে। আর বিলটা যাতে তাড়াতাড়ি পাশ হয়ে যায় তার জন্যেও তাঁকে অনুরোধ করা যাবে। এমনি সব কথা চিন্তা করতে করতে রায় এসে ঢুকে পড়েন রায় বাহাদুরের অফিস ঘরে রাইটার্স বিল্ডিংসের দোতালায়।

কী হে, কী ব্যাপার! হঠাৎ তোমার আবির্ভাব! এই বাজারেও শুনছি ব্যবসা ট্যবসা তোমার বেশ ভালোই চলছে?

না, কোথায় স্যার! ব্যবসার কি আর কিছু আছে?

তাহলে ?

এই ব্যবসার ব্যাপারেই একটা খবর জানতে এসেছিলাম আপনার কাছে।

কী খবর চাও, বলো ?

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে একটা অর্ডার পেয়েছি। সেই সম্পর্কেই আপনার পরামর্শ চাই। এর আগে জেল বিভাগের সঙ্গে আমার কোন কারবার হয়নি কিনা তাই ভাবছিলাম। মাল সরবরাহের নিয়ম-কানুনগুলো আগে থেকেই জেনে নিলে কাজের সুবিধে হবে।

কিসের অর্ডার পেয়েছো, শুনি।—রায় বাহাদুর একটু চমকে ওঠেন অর্ডারের কথায়। তবু তিনি উৎকর্ণ হয়েই শোনেন নির্মলেন্দুর সব কথা।

দশ হাজার মণ চা'ল সরবরাহের কন্‌ট্রাক্ট পেয়েছি, এখন কাজটা ঠিক ঠিক মতো করে উঠতে পারলে হয়তো কিছু থাকবে। সরকারি ব্যাপার বলেই এ অর্ডার নিতে ভরসা পেয়েছি। তা না হলে কোন কন্‌ট্রাক্টই সাহস করে নেওয়া যায় না।

দশ হাজার মণ চা'লের অর্ডার! আচ্ছা, বার কর দেখি তোমার সব কাগজপত্র। অর্ডারটা আছে তোমার সঙ্গে ?

হ্যাঁ।—তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে বার করে নির্মলেন্দু ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের সই করা অর্ডার পত্রখানি রায় বাহাদুরের হাতে তুলে দেন ভয়ে ভয়ে।

এ একদম জাল অর্ডার। কোথা থেকে পেলে তুমি এ অর্ডার, নির্মলেন্দু ?—রায় বাহাদুর বেশ একটু উত্তেজিতভাবেই প্রশ্ন করেন.

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা শুনেই রায় বাহাদুর বল্লেন, সেন একজন দাগী জুয়াচোর। প্রতারণার দায়ে তাকে অনেকবার জেল খাটতে হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, তবু লোকটার শিক্ষা হয়নি!

এই বলেই রায় বাহাদুর তাঁর আসন ছেড়ে উঠে পড়েন এবং পাশের ঘরে কর্নেল সিম্পসনের কাছে নির্মলেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন। সেনের এই কীর্তি-কাহিনী শুনে খুবই দুঃখ প্রকাশ করেন সায়েব। দণ্ডিত আসামী হলেও কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের জন্যে সেনকে তাঁর খুব ভাল লাগতো, সে কথা নি সঙ্কোচেই তিনি খুলে বললেন।

বারো বছর আগের কথা। সেন তখন আলিপুর জেলের কয়েদী। তখনই তার সঙ্গে কর্নেল সিম্পসনের প্রথম পরিচয়। ইংরেজি কথাবার্তায় ওস্তাদ। চাল-চলনে, আদব-কায়দায় পাক্কা সায়েব। সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিত ও সুন্দর যুবক। সর্বোপরি বেশ বুদ্ধিমান। এমন একটি ছেলে প্রতারণার দায়ে দণ্ডিত হয়েছে বলে সিম্পসনের মনে কেমন যেন একটু ব্যথানুভব হয়েছিল তখন। সেনকে তাই ইয়োরোপীয় কয়েদীদের পর্যায়ে থাকবার বিশেষ বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন তিনি। জেল থেকে খালাস পাবার পর তাকে একটা বৃটিশ ফার্মে চাকুরিও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত চিঠি নিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজের সংগে ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয়ের সুযোগও হয়েছিল সেনের। কিন্তু প্রতারণার দায়ে বছর না ঘুরতেই তার সে চাকুরিও যায় এবং তার পরিচিত সায়েবরাও তার সম্পর্কে বেশ সতর্ক হয়ে যান। সেবারেও আট মাস সশ্রম কারাবাস ঘটেছিল সেনের ভাগ্যে। তা সত্ত্বেও কর্নেল সিম্পসন তার চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা ছাড়েননি। দ্বিতীয়বার জেল থেকে ছাড়া পাবার পরেও তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেনকে এবং তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও আদায় করেছিলেন যে, সে আর অসৎপথের আশ্রয় নেবে না। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে আবার সে ধরা পড়ে। এবার কর্নেল সিম্পসনের এক বন্ধুকেই সে ঘায়েল করে তাঁরই লিখিত ব'লে একটা জাল চিঠি দেখিয়ে।

একেবারে নগদ দু' হাজার টাকা নিয়ে উধাও! সেই থেকে সব আশাই সিম্পসন ছেড়ে দিয়েছেন সেন সম্পর্কে। এ ধরণের অনেক ভদ্র ছেলেকে উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিয়ে সৎপথে নেবার তাঁর চেষ্টা সফল হলেও সেনকে সংশোধন করা যে অসম্ভব তা তিনি অনেক আগেই বুঝেছিলেন। কাজেই তাঁর এই সর্বশেষ জালিয়াতির জন্যে তাঁর দুঃখ বোধ হলেও তিনি মোটেই বিস্মিত হননি একথা খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করলেন সিম্পসন সায়েব।

কর্ণেল টেলিফোনটা তুলে ডাকলেন পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টকে। সব ঘটনা শুনে টেগার্ট সায়েব তো অবাক! তাঁর পুলিশী শাসনে সারা কলকাতা যখন সন্ত্রস্ত, তখন একটা দাগী জুয়াচোর জেলখানার নাম করে অন্য লোককে প্রতারণা করতে সাহস পাচ্ছে, এতো আশ্চর্য হবারই কথা। সেনকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার অনুরোধ জানাতেই সিম্পসন সায়েবকে পুলিশ কমিশনার পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, এবার তাকে ধরে এনে লালবাজারে এমনি ধোলাই দেওয়া হবে যাতে আর এ ধরণের ঠকবাজি করার কথা তার মনেও না আসে এবং মনে এলেও এমন কাজ করার মতো কোন ক্ষমতা তার না থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে সিম্পসন সায়েব একটা চিঠি লিখে দেন নির্মলেন্দুকে। এই পরিচয় পত্র নিয়ে রায় যেয়ে উপস্থিত হলেন লালবাজারে। সে কী ভয়ংকর রূপ তখনকার দিনের লালবাজার পুলিশ অফিসের। লালবাজারের নামে যেন ভয়ে আতংকে লোকের চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। সেই লালবাজারের ভেতরে যেয়ে উপস্থিত হওয়া সে কি বড়ো কম সাহসের কথা! তবে সঙ্গে পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেলের স্বহস্ত লিখিত পরিচয় পত্র রয়েছে, নির্মলেন্দুর সেই ভরসা।

এদিকে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন

এবং আর এক দিকে বাংলার মরণজয়ী সন্ত্রাসবাদীদের দুরন্ত অভিযান। এই দ্বিমুখী আক্রমণ প্রতিরোধে কলকাতায় টেগার্ট সায়েব তখন ব্যতিব্যস্ত। একটা বিরাট রণক্ষেত্রের জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের রূপ নিয়েছে তখন লালবাজার। সে সময় পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে সহজে কথা বলার সুযোগ পাওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়াই একরূপ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এই অবস্থায় টেগার্ট সায়েবের সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী একথা বলা মাত্রই একদল ছদ্মবেশী বাঙালী পুলিশ আর একদল গোরা সার্জেণ্ট নির্মলেন্দুকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তোলে। পরে অবশ্য সিম্পসন সায়েবের চিঠি দেখাতেই জিজ্ঞাসাবাদ বন্ধ করে পুলিশ কমিশনারের ঘরে তারা পৌঁছে দেয় তাঁকে।

কমিশনারের ঘরে ঢুকেই কেমন যেন একটা ভারি আবহাওয়া অনুভব করেন রায়। স্তূপীকৃত ফাইল পত্র বিরাট টেবিলের এপাশে ওপাশে। বহু দুশ্চিন্তার প্রতীক যেন এসব। নতুন মানুষের পদশব্দে ফাইল থেকে একবার চোখ তুলে তাকান টেগার্ট সায়েব।

ইয়েস্!

আই এম ফ্রম কর্ণেল সিম্পসন স্যার!—এই বলে নির্মলেন্দু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে ধরেন সিম্পসনের চিঠিখানা।

হ্যাভ ইওর সিট প্লিজ!—নির্মলেন্দুকে বসতে বলে টেগার্ট সায়েব মিঃ হার্টলিকে ডেকে পাঠান।

গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী কমিশনার মিঃ হার্টলি। বিভাগীয় কৃতিত্বের জন্য শাসক মহলে খুবই সুনাম তাঁর। পুলিশ কমিশনারের ডাকে তিনি ছুটে আসেন তাঁর ঘরে। খুবই অল্প কথায় টেগার্ট তাঁকে যথাযথ নির্দেশও দিয়ে দেন।

খুব অস্বাভাবিক গুরুগম্ভীর মিঃ টেগার্ট! রায়ের মনে একটা

গম্ভীর রেখাপাত করে টেগার্টের গাম্ভীর্য, তাঁর ঘরের নিস্তব্ধতা। রায়কে নিজের ঘরে নিয়ে যেয়ে মিঃ হার্টলি আরো বিশদভাবে শুনে নেন সেনের প্রতারণার কাহিনী। সেন হার্টলির পরিচিত। তবে খুব বেশি দিনের নয়। কারণ তিনি কলকাতায়ই এসেছেন মাত্র বছর চারেক। এর আগের কেসটায় সেন তাঁর হাতেই ধরা পড়েছিল। কর্ণেল সিম্পসনের এক বন্ধুকে প্রতারণা করে সেবার উধাও হয়েছিল সে।

একজন অভিজ্ঞ ইন্সপেক্টরকে ডেকে সেনকে ধরে আনবার আদেশ দেন মিঃ হার্টলি। আরো চার পাঁচজন সাদা পোষাকের পুলিশ সঙ্গে নিয়ে ইন্সপেক্টর অনুসরণ করেন নির্মলেন্দুকে। ইন্সপেক্টরের পরিধানেও সাধারণ পোষাক।

কথা ছিল বেলা একটা থেকে দু'টোর মধ্যে সেনের মেসে টাকা নিয়ে যাবেন নির্মলেন্দু। সেন কোন্ ঘরে থাকে তা সঠিকভাবে না জানলেও ঐ মেস বাড়িতে রায় বার দুই গিয়েছেন তাঁর বন্ধু ভবেশ পাঠকের সঙ্গে। সমবায় ম্যানসন বিল্ডিংস্ অর্থাৎ হিন্দুস্থান ইনস্যুর্যান্স কোম্পানীর পুরনো অফিস বাড়ি। সে বাড়িরই একটা অংশে ছিল এই মেস।

সেনের ঘর সঠিকভাবে না জানলেও তা বার করে নিতে খুব অসুবিধা হবে না! কারণ পাঠকেরই কাছে রায় শুনেছেন যে, মেসে তাঁরই পাশের ঘরটা ভাড়া নিয়েছে সেন। সে ভরসাতেই নির্মলেন্দু সরাসরি সমবায় ম্যানসনে যেয়ে উঠেন পুলিশ বাহিনী নিয়ে। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে থাকে পুলিশের গাড়ি। পুলিশ বাহিনীও একেবারে সোজা তেতলায় উঠে না গিয়ে সিঁড়িতে অপেক্ষা করতে থাকে। রায় যেয়ে আন্দাজেই পাঠকের ডান পাশের ঘরের দরজায় অতি সূক্ষ্ম দুটি টোকা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ইন্সপেক্টরের পরামর্শ মত। রায়ের জন্যে অপেক্ষা

করতে করতে এতক্ষণে অধীর হয়ে উঠেছিল সেন। একটাও বেজে গেছে অনেকক্ষণ। অস্থির হবারই কথা। ইতিমধ্যে ক'বারই সে জানলায় মুখ গলিয়ে রাস্তার দু'দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছে নির্মলেন্দুকে দেখা যায় কিনা দেখতে। পাঠকের সঙ্গে সে নানা প্রসঙ্গ আলাপ করে চলেছে। কিন্তু সে সমস্ত কথা যেন নিষ্প্রাণ, অর্থহীন। নির্দিষ্ট সময় চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের কাছে এ অবস্থাটা যেন বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। সেনের সমস্ত চেতনা, তার সমস্ত অনুভূতিই যেন অন্য কিছুর প্রতি নিবিষ্ট হয়ে পড়েছে তিনি তা লক্ষ্য করছিলেন। নির্মলেন্দুর দেরীর জন্যেই হয় তো হবে, এ কথাও তাঁর মনে হয়েছে।

এরই মধ্যে দরজায় সূক্ষ্ম টোকার শব্দ কাণে যায় সেনের। পাঠক মোটেই শুনতে পাননি সে শব্দ। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। সেনের অস্থিরতা লক্ষ্য করেই হয়তো হয়ে থাকবে।

সেন ছুটে যেয়ে ভেজানো দরজার একটি কবাট খুলতেই দেখতে পায় নির্মলেন্দুকে।

ভেতরে আসুন। এনেছেন ?

সেনের প্রশ্নের জবাব দেবার আর ফুরসুৎ মেলে না। খটাখট শব্দ করতে করতে পুলিশের দল এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু চোখের নিমেষে কখন যে সেন পিছনের দরজা দিয়ে উধাও হয়ে যায় ওস্তাদ পুলিশেরাও তার কোন হদিস করতে পারে না। ঠিক যেন ম্যাজিকের মতোই মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটা।

কিন্তু এ ব্যাপারে নির্মলেন্দুকে যেভাবে অপ্রস্তুত হতে হলো তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। সেনের ঘরে পাঠককে পেয়ে তাঁকেই গ্রেপ্তার করার আদেশ দেন ইন্সপেক্টর।

এঁকে নয়, এঁকে নয়। এঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই

আমার। ইনি আমারই ছোটবেলার বন্ধু।—রায় তাঁর বন্ধু ভবেশ পাঠককে রক্ষা করবার জন্যে অনেক অনুনয় বিনয় করেন ইন্সপেক্টরের কাছে, কিন্তু কোন ফলই হয় না তাতে।

হতে পারেন তিনি আপনার প্রাণের বন্ধু। তাঁর বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিযোগও না থাকতে পারে। কিন্তু যার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ তাকে ধরবার জন্যেই ওঁকে গ্রেপ্তাব করা প্রয়োজন। হার্টলি সায়েবের কাছে পর্যন্ত এঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতেই হবে। মূল আসামী চোখে ধূলি দিযে পালিয়ে গেল, আর আমি যদি খালি হাতে যেযে সাযেবের কাছে হাজির হই, তা'হলে আমার ইজ্জৎটাই বা কোথায় থাকে বলুন ?—সমস্ত বিষয়টা বেশ খোলাখুলি ভাবেই বলেন ইন্সপেক্টর।

আমায় কিন্তু ভুল বুঝো না পাঠক। আমি সত্যি ভাই কল্পনাও করতে পারিনি যে এমনি হাল হবে তোমার।

—হাতকড়া আর কোমরে দড়ি দিযে টানতে টানতে যখন ভবেশ পাঠককে সিঁড়ি দিযে নামিযে নেয পুলিশের লোকেরা, তখন নিতান্তই যেন অপরাধীর মতো বন্ধুর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেন নির্মলেন্দু। সত্যি সত্যি গভীর দুঃখে অন্তর তাঁর ভরে ওঠে পাঠকের এ অপমানজনক অবস্থার জন্যে।

তা' ভাই যেমনি কর্ম তেমনি ফল। তোমার আর কী দোষ এতে ?—পাঠক তাঁর এ লাঞ্ছনা ও অবমাননার সমস্ত দায়িত্ব এই বলে নিজের ঘাড়ে টেনে নিলেও রায় কিছুতেই যেন নিজেকে এ ব্যাপারে দায়মুক্ত বলে ভাবতে পারছেন না।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত হার্টলি সায়েবের কাছে পাঠককে এ অবস্থায় এনে উপস্থিত করতেই তিনি প্রথমটায় ইন্সপেক্টরের কাজের তারিফ করলেন বটে কিন্তু মূল আসামীর আকস্মিক পলায়নের কথা শোনা মাত্রই

তিনি একেবারে অগ্নিশর্মা। তারপর নির্মলেন্দু যখন সায়েবকে বুঝিয়ে বল্লেন যে, যাঁকে ধরে আনা হয়েছে তিনি তাঁরই লোক এবং সম্পূর্ণ নির্দোষ, তখন মিঃ হার্টলি আরো গরম হয়ে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিলেন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন রায়। তাঁর বন্ধু ভবেশ পাঠক তো বটেই!

রায় এবং পাঠক যখন হার্টলি সায়েবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসেন তখন সায়েব তাঁদের এই বলে আশ্বাস দেন যে, তিনি নিজেই এ কেস্‌টা হাতে নিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সেনকে লালবাজারে উপস্থিত করবেন।

সে যা হয় হবে। দারুণ প্রতারণার হাত থেকে যে রেহাই পাওয়া গেছে এবং পাঠককে যে সহজেই ছাড়িয়ে আনা সম্ভব হয়েছে তাই বড় কথা। এমনি ধারায় ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে আসেন নির্মলেন্দু বন্ধু পাঠকজীকে নিয়ে এবং বন্ধুকে একটু আশ্বস্ত করার জন্যেই তাঁকে সঙ্গে করেই বাড়ি ফেরেন।

* * *

প্রায় মাসখানেক পরের ঘটনা। রাত তখন প্রায় ১০টা। সবেমাত্র শয্যা গ্রহণ করেছেন নির্মলেন্দু। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে ওঠে। ভীষণ আলস্য লাগে নির্মলেন্দুর বিছানা ছেড়ে এসে টেলিফোনটা ধরতে।

হ্যালো, কে বলছেন আপনি?

বৌবাজার থানা থেকে বলছি। মিঃ রায় আছেন?

ধরুন একটু।—থানা থেকে এত রাত্রে আবার কিসের ফোন? বেশ একটু ভাবিত হয়েই পড়েন রায়গিন্নী ফোনটা হাতে ধরে রেখেই চিন্তাকুল স্বরে ডেকে তোলেন রায়কে।

ওগো শুনছো ? ছাখো, কেন আবার থানা থেকে ডাকছে এই রাত দুপুরে।

থানার কথা শুনেই ধড়মড় করে উঠে মশারির বাইরে বেরিয়ে আসেন নির্মলেন্দু।

হ্যালো, কী ব্যাপার ?

ব্যাপার তেমন কিছু নয় স্যার। তবে আপনাদের সেই মিঃ সেন ধরা পড়েছেন। আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে বৌবাজার থানায় আপনার একবার এখুনি আসা দরকার।

সে কী মশাই, এযে একেবারে এক 'মিডনাইট ড্রামা'র আয়োজন করে বসেছেন দেখছি !

তা আর কী করবো, বলুন স্যার। খোদ হার্টলি সায়েবের হুকুম, আজ রাত্তিরেই আপনাকে দিয়ে সেনকে সনাক্ত করিয়ে নিতে হবে।

কেন, এতো তাড়াহুড়োর কি আছে এতে ? আর কখন ধরা পড়েছেন শ্রীমান বলুন তো ?

এই তো, এইমাত্র এক ঘণ্টাও হয়নি।

কোথায় গিয়ে ধরলেন সেনকে ?

সে অনেক কথা। এলেই সব শুনতে পাবেন স্যার। তার এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রণয়িনীর ক্রীক রো'র ঘর থেকে অনেক চেষ্টার পর আজ তাকে উদ্ধার করা যায়।

ও-সির কথায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন নির্মলেন্দু। কিন্তু এত রাত্তিরে ভবানীপুর থেকে বৌবাজারে যাওয়া, সেতো বড়ো সহজ কথা নয়। তাই ইচ্ছে থাকলেও এড়িয়ে যাবারই চেষ্টা করেন রায়।

খুব জোর ধরেছেন তো ! এ যে সত্যি একটা মহা রোমাণ্টিক ব্যাপার ! তা দেখুন একটা কথা, কাল খুব সকালে যেয়েই সনাক্ত

তিনি একেবারে অগ্নিশর্মা। তারপর নির্মলেন্দু যখন সায়েবকে বুঝিয়ে বল্লেন যে, যাঁকে ধরে আনা হয়েছে তিনি তাঁরই লোক এবং সম্পূর্ণ নির্দোষ, তখন মিঃ হার্টলি আরো গরম হয়ে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিলেন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন রায়। তাঁর বন্ধু ভবেশ পাঠক তো বটেই!

রায় এবং পাঠক যখন হার্টলি সায়েবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসেন তখন সায়েব তাঁদের এই বলে আশ্বাস দেন যে, তিনি নিজেই এ কেস্‌টা হাতে নিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সেনকে লালবাজারে উপস্থিত করবেন।

সে যা হয় হবে। দারুণ প্রতারণার হাত থেকে যে রেহাই পাওয়া গেছে এবং পাঠককে যে সহজেই ছাড়িয়ে আনা সম্ভব হয়েছে তাই বড় কথা। এমনি ধারায় ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে আসেন নির্মলেন্দু বন্ধু পাঠকজীকে নিয়ে এবং বন্ধুকে একটু আশ্বস্ত করার জন্যেই তাঁকে সঙ্গে করেই বাড়ি ফেরেন।

প্রায় মাসখানেক পরের ঘটনা। রাত তখন প্রায় ১০টা। সবেমাত্র শয্যা গ্রহণ করেছেন নির্মলেন্দু। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে ওঠে। ভীষণ আলস্য লাগে নির্মলেন্দুর বিছানা ছেড়ে এসে টেলিফোনটা ধরতে।

হ্যালো, কে বলছেন আপনি?

বৌবাজার থানা থেকে বলছি। মিঃ রায় আছেন?

ধরুন একটু।—থানা থেকে এত রাত্রে আবার কিসের ফোন? বেশ একটু ভাবিত হয়েই পড়েন রায়গিন্নী ফোনটা হাতে ধরে রেখেই চিন্তাকুল স্বরে ডেকে তোলেন রায়কে।

ওগো শুনছো? গ্যাখো, কেন আবার থানা থেকে ডাকছে এই রাত দুপুরে।

থানার কথা শুনেই ধড়মড় করে উঠে মশারির বাইরে বেরিয়ে আসেন নির্মলেন্দু।

হ্যালো, কী ব্যাপার?

ব্যাপার তেমন কিছু নয় স্যার। তবে আপনাদের সেই মিঃ সেন ধরা পড়েছেন। আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে বৌবাজার থানায় আপনার একবার এখুনি আসা দরকার।

সে কী মশাই, এযে একেবারে এক 'মিডনাইট ড্রামা'র আয়োজন করে বসেছেন দেখছি!

তা আর কী করবো, বলুন স্যার। খোদ হার্টলি সায়েবের হুকুম, আজ রাত্তিরেই আপনাকে দিয়ে সেনকে সনাক্ত করিয়ে নিতে হবে।

কেন, এতো তাড়াহুড়োর কি আছে এতে? আর কখন ধরা পড়েছেন শ্রীমান বলুন তো?

এই তো, এইমাত্র এক ঘণ্টাও হয়নি।

কোথায় গিয়ে ধরলেন সেনকে?

সে অনেক কথা। এলেই সব শুনতে পাবেন স্যার। তার এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রণয়িনীর ক্রীক রো'র ঘর থেকে অনেক চেষ্টার পর আজ তাকে উদ্ধার করা যায়।

ও-সির কথায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন নির্মলেন্দু। কিন্তু এত রাত্তিরে ভবানীপুর থেকে বৌবাজারে যাওয়া, সেতো বড়ো সহজ কথা নয়। তাই ইচ্ছে থাকলেও এড়িয়ে যাবারই চেষ্টা করেন রায়।

খুব জোর ধরেছেন তো! এ যে সত্যি একটা মহা রোমান্টিক ব্যাপার! তা দেখুন একটা কথা, কাল খুব সকালে যেয়েই সনাক্ত

করার কাজটা সেরে ফেলা যাবে। এই রাত দুপুরে ট্যাক্সি যোগাড় করা সে এক কঠিন সমস্যা। ওসব হাঙ্গামায় এখন আর যেতে চাইনে।

না, না স্যার তা হবে না। আমাদের থানার গাড়ি এতক্ষণে হয়তো আপনার বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই ও জন্যে আপনাকে হাঙ্গামা পোয়াতে হবেনা কিছু। আপনি দয়া করে চলে আসুন। তা নইলে আমার আর জবাবদিহির অন্ত থাকবেনা। সেদিন আসল আসামীকে না পেয়ে আপনার বন্ধুকে ধরে নিয়ে পরে যে আমার কি রকম নাকমলা কানমলা খেতে হয়েছিল স্যার তা আর কি বলবো! হার্টলি সায়েবের মেজাজ সর্বক্ষণেই সপ্তমে চড়া। অর্ডারের একচুল এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। সেদিনই লালবাজার থেকে বৌবাজার থানায় আমার বদলির হুকুম হয়েছে, আর সেই থেকে তিনি আমার ওপর তিরিক্ষি হয়ে আছেন। ভাগ্যি, আমার হাতেই ধরা পড়েছে সেন। হার্টলি সায়েবকে ফোন করে জানাতেই তিনি খুব খুশি। আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নিয়ে সনাক্ত করার কথা তিনিই বলেছেন। কাজেই তা যদি আমি না করিয়ে নি তাহলে আমার সব কৃতিত্বই মাঠে মারা যাবে স্যার। কাজেই দয়া করে আপনি এখুনি চলে আসুন।

ঠিক আছে। এই যে আপনার গাড়িও এসে গেছে।

বেশ, আর দেরী করবেন না স্যার তাহলে।

আচ্ছা, এখুনি চলে আসছি আমি। সামনা সামনিই আর বাকি সব কথা হবে'খন।—এই বলে টেলিফোনটা রেখেই কোন রকমে একটা পাঞ্জাবী গায়ে পুরে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন নির্মলেন্দু।

বৌবাজার থানার ও-সি মিঃ বর্মণ থানার দরজাতেই অপেক্ষা

করছিলেন রায়ের জন্যে। গাড়ি ফিরে আসতেই নির্মলেন্দুকে নিয়ে ও-সি একেবারে সোজাসুজি হাজত ঘরে যেয়ে উপস্থিত।

সেন তখন কেমন যেন একটু ভাবিত ভাবেই পায়চারি করছিল হাজত ঘরে। রায়কে দেখেই একটু থমকে দাঁড়ায় সে। কিন্তু কোন সংকোচ বা লজ্জার লেশমাত্র নেই তার মধ্যে। বরং নিতান্ত সহজ এবং সরল ভাবেই সবিনয় নমস্কার জানিয়ে নিজে থেকেই প্রশ্ন করে সে নির্মলেন্দুকে—

এই যে মিঃ রায়, নমস্কার। এতো রাত্তিরে এই থানা হাজতে! কী ব্যাপার? আমায় সনাক্ত করার জন্যে বুঝি তলব হয়েছে? কী অন্যায় বলুন দেখি!

ধর্মাবতার সেনের মুখে ন্যায় অন্যায়ের কথা শুনে আর তার অসংকোচ আলাপের সাহস দেখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন নির্মলেন্দু।

মিঃ রায়কে দেখছি একেবারেই নির্বাক। অন্ততঃ দারোগাবাবুর সঙ্গেই না হয় দু'একটা কথা বলুন। তা' না হলে তিনিই বা আপনার সম্বন্ধে কী একটা আইডিয়া করে নেবেন, ভেবে দেখুন।

ও নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই মিঃ সেন। আপনি নিজের চরকায় তেল দিন। নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করুন। ভদ্রলোকের ছেলে এসব কি কেলেংকারি করছেন বলুন দেখি!

এসব আপনি কী বলছেন মিঃ রায়? জীবনে জোয়ার-ভাটা থাকবেই। এই ধরুন না বছর তিনেক ধরে জোয়ারে গা ভাসিয়ে চলেছি, এবার আবার হয়তো বছর দুই ভাটার টানে কাটবে। তবে একটা কথা কি জানেন, মানুষকে বেশি বিশ্বাস করতে নেই। এই দেখুন না, প্রায় দু'বছর ধরে মেরিনা মেয়েটা আমাকে কী ভাবেই না শোষণ করলে। আর শেষটায় কিনা সে-ই আমায় ধরিয়ে দিলে! আপনার

কেসটায় সাক্সেস্ফুল হলে আজ হয়তো এ হাল আমার হতো না। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটা আমার হাতেই থাকতো। আমায় পুরোপুরি বিশ্বাস না করে আপনি বেঁচে গেছেন। আর দেখুন, মেরিনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে আমি আজ এই থানা হাজতে। আপনিই ঠিক মিঃ রায়, আপনিই ঠিক। মানুষকে বেশি বিশ্বাস করলেই ঠকতে হবে, এতে কোন ভুলই নেই। তবে একটা কথা কি জানেন মিঃ রায়, আপনারা বছরের পর বছর ধরে যা আয় উপায় করেন, তার থেকে বড়ো কম রোজগার হয় না আমার দু'তিন বছরের ইণ্টারভ্যাল সত্বেও। কাজেই, কোন অবস্থার জন্যেই খুব বেশি দুঃখ নেই আমার। ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্যই, কী বলেন ?

বাঃ, ভারি চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারেন তো মিঃ সেন। তা, এতো গুণ থাকতেও জীবিকার্জনের এমন একটা অসৎ পথ কেন বেছে নিলেন বলুন তো ! এবার থেকে সোজা পথ ধরে চলতে সুরু করুন।

আর এবার ! আগেই তো বলেছি যে, দু'বছরের ধাক্কায় হয়তো পড়ে গেলাম। তাছাড়া এতদিনের একটা অভিজ্ঞতাকে কাজে না লাগিয়ে আপনার উপদেশমত একেবারে বাতিল করে দেবো এইবা আপনি কী করে আশা করতে পারেন ? আচ্ছা মশাই, আমার মতো চুনোপুঁটিকে তত্ত্বকথা না শুনিয়ে দু'একটা রাঘববোয়ালকে উপদেশামৃত বর্ষণে কাবু করুন দেখি, তাহলে বুঝবো আপনার ক্ষমতাটা। এই ধরুণ না বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই দেশটাকে কিভাবে লুটেপুটে শেষ করে দিচ্ছে। ওদের একটু সৎ পরামর্শ দিয়ে পরদেশ লুণ্ঠনে নিরস্ত করুন দেখি। আন্তর্জাতিক দস্যুতার অবসান না ঘটলে ছোটখাটো চুরি জোচ্চুরি কথ্খনো বন্ধ করা যাবে না, একথা আমি স্পষ্ট করেই বলে দিচ্ছি। অভাজনের কথাটা দয়া করে মনে রাখবেন মিঃ রায়।

চলুন স্যার, চলুন।—এই বলে রায়কে নিয়ে ও-সি বেরিয়ে যান হাজত ঘর থেকে। যেতে যেতে সেনের যুক্তির সারবত্তা বেশ খানিকটা নাড়া দেয় রায়ের মনকে।

নিজের অফিস ঘরে বসে ও-সি বর্মণ সায়েব রায়কে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেন কি করে এবং কতো চেষ্টার পর ধরতে পারা গেছে সেনকে। এই প্রসঙ্গে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণী মেরিনা মার্কাসের সঙ্গে সেনের বিচিত্র প্রণয়কাহিনীও পুরোপুরি জেনে নেন নির্মলেন্দু।

অনেক রাত হয়ে গেল, এবার যাওয়া যাক্ মিঃ বর্মণ।

হ্যাঁ, নিশ্চয়। আর আটকে রাখা চলেনা আপনাকে। বাড়িতে মিসেস্ রায় খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন হয়তো। রাত দশটায় একা একা পুলিশের গাড়ি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা এমনিতেই তো চিন্তার কথা। কী বলেন? একটা সই দিতে হবে স্যার আপনাকে। এই বলে বর্মণ একখানা বিরাট খাতা এগিয়ে দেন নির্মলেন্দুর সামনে।

আইডেন্টিফিকেশনের খাতায় পুরো স্বাক্ষর দিয়ে রায় উঠে পড়েন। সেনকে সনাক্ত করা সম্পর্কে যা কিছু লেখার তা থানার লোকরাই খাতায় লিখে দিয়েছিলেন। একেবারে বাঁধা গৎ। তারই নিচে সই করে দিয়ে নির্মলেন্দুর কাজ শেষ।

গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার দাঁড়িয়েই ছিল থানার সামনে। রায় যখন গিয়ে বাড়ি পৌঁছলেন তখন রাত প্রায় বারোটা। রায়গিন্নী চিন্তায় ঘুমুতে পাচ্ছেন না, তবু ঘুমকাতর।

বলিহারি তোমার দায়িত্বজ্ঞান! বাইরে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের কথা একেবারে কী করে ভুলে যাও বলো দিকিনি। রাত্ত-দুপুরে বেড়াতে বেরিয়ে গেলে, তাও আবার থানার গাড়িতে। থানায় গিয়ে একটা ফোনও তো করতে পারতে। না ভাবো, তোমার ভাবনা

ভাববার জন্যে কেউ নেই সংসারে ? —ঘরের দরজা খুলে দিতে দিতেই রায়গিন্নী বাক্যবাণ বর্ষণ সুরু করে দেন।

আরে অনেক মজার ব্যাপার আছে। শুনলে আর এমনি করে তুমি আমায় গালাগাল দেবে না। —উত্তরে রায় শুধু এটুকু বলেই চুপ করে যান।

ভারি বয়ে গেছে আমার এই রাত দুপুরে তোমার মজার ব্যাপার শোনার জন্যে —এই বলে গিন্নী যেয়ে শুয়ে পড়েন।

নির্মলেন্দু আর কথা না বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে খাটের ফাঁকা জায়গাটুকুতে চুপচাপ যেয়ে শয্যাগ্রহণ করেন। গৃহিণীর এ ধরণের মেজাজের সঙ্গে সবিশেষ পরিচয় থাকলেও সামান্য কোন কথা তুলে নৈশ শান্তিকে কোন রকমেই আর বিঘ্নিত করতে চাইলেন না রায়।

বাইরের পৃথিবীতে চতুর্দিকের নিস্তব্ধতার মধ্যেও গাছের পাতা নড়ার শব্দ কানে আসে। দু'একটা পশুপাখির ডাকও হঠাৎ হঠাৎ শোনা যায়। কিন্তু ঘরের নীরবতা কেমনই যেন বড্ড ভারি ভারি ঠেকছে রায়ের কাছে। তবু একদম নিঃশব্দ হয়েই শুয়ে থাকেন তিনি।

কিগো, বালিশে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়লে দেখছি। ঘুমের ওষুধ কিছু খাইয়ে দিয়েছেন নাকি থানার কর্তারা ? —অন্ধকারের মৌনতা উচ্ছল হয়ে ওঠে রায়গিন্নীর রহস্য প্রশ্নে।

নির্মলেন্দু তবু নীরব।

ওগো শুনছো, বলো না কী তোমার সেই মজার ব্যাপার।—গৃহিণী পাশ ফিরে ডাকেন স্বামীকে। কেমন যেন একটু মিনতি মেশানো সে ডাক। মনে মনে একটু ভয়ও হয়েছিল তাঁর। হয়তো তাঁর অত্যধিক কড়া মেজাজ দেখে স্বামী দেবতা একটু বেশিই ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবেন।

এই ভয়। তাছাড়া, মজার ব্যাপারটা শুনে নেবার নারীসুলভ আগ্রহ-টাও ছিল তাঁর খুব।

মজার ব্যাপার মানে সেনের ব্যাপার। বেচারা তিন বছর ধরে একটা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ে, তারপর কিনা তার পাতা ফাঁদেই পুলিশের হাতে ধরা পড়লো। —স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে এতোক্ষণে মুখ খুললেন নির্মলেন্দু।

সে আবার কেমন কথা?

কেমন কথা আর কি। মেয়েদের বেশি বিশ্বাস করার ফল।

তোমাদের পুরুষজাতের কথা আর বলো না। লজ্জার মাথা খেয়ে অজানা অচেনা মেয়েদের বিশ্বাস করতে যাবার কী দরকার হতে পারে শুনি।

সুযোগমত এক পাল্টা প্রশ্নে বেশ এক হাত নিয়ে নেন রায়গিন্নী। নির্বিবাদে নির্মলেন্দু এড়িয়ে যান সে প্রশ্ন।

যাকগে ওসব তর্কের কথা। যা ঘটেছে তাই শোনো। —এই বলে নির্মলেন্দু বলে যেতে থাকেন সেনের প্রেমকাহিনী আর তার পরিণতির কথা। বৌবাজার থানার ও-সির মুখ থেকে সদ্য শোনা কথা।

চৌরঙ্গীর এক রেষ্টুরেন্ট গার্ল মেরিনা মার্কাস। বছর চারেকের পুরনো চাকরি তার। এণ্টনি মার্কাসের সঙ্গে বিয়ে হবার পরে সে এ কাজ নিয়েছে। আগে একটা বিলিতি সিনেমা হাউসে টিকিট বিক্রি করতো। সে চাকরিটা ভালোও লাগতো না তার বসা কাজ বলে, আর সেখানে মাইনেও ছিল কম। এণ্টনির যে জলুস দেখা দিয়েছিল আগে, বিয়ের পর তার ফাঁকি ধরে ফেলে মেরিনা স্বামীর অসাধু পথের উপার্জনের কথা আর গোপন থাকে না। তবু তার জন্যে একটা গভীর আকর্ষণ বোধ করে সে। তাকে নিয়ে সুন্দর করে সে একটি সংসার

গড়ে তুলতে চায়! কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না। নোট জালের অভিযোগে ধরা পড়ে তিন বছরের জেল হয়ে যায় এণ্টনির। সশ্রম কারাদণ্ড।

বছর না ঘুরতেই মেরিনার আবার সেই পুরনো অবস্থা। বুড়ো অন্ধ বাপকে নিয়েই কি তার কম জ্বালা! তবু এই বুড়োই তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। সে কথা সে ভুলতে পারে না। তার মা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার বাবার সঙ্গেও। তার বাবার পঙ্গুত্বের সুযোগে তার মা গৃহত্যাগিনী হয়েছে পয়সাওয়ালা কোন্ এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে। খুব ভালো বেহালা নাকি বাজাতে পারতো সেই ব্যবসায়ী। তার বাবার সঙ্গে তার ছিল খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সেই সূত্রেই তাদের বাড়িতে ছিল তার অবাধ যাতায়াত। তাকে নিয়ে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় তাদেরই বাড়িতে চলতো বেহালা বাজনা আর পান ভোজন। তারপর একদিন তার মাকে নিয়ে একদম উধাও হয়ে যায় সেই ব্যবসায়ী। মেরিনা তখন শিশু। বছর দুই তিন বয়েস। এসব কথা সে বড়ো হয়ে শুনেছে তাদের প্রতিবেশিনী আণ্ট মার্গারেটের কাছ থেকে। সে আরো শুনেছে যে তার মা ছিল তার বাবা নোবেল ফার্লোর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। এ সবই আণ্ট মার্গারেট বলেছে তাকে সে যখন বড়ো হয়েছে, সব বুঝতে শিখেছে।

তার মায়ের রক্তই কি মেরিনার মধ্যে মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে? এণ্টনি মার্কাসের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। তা সত্ত্বেও হ্যারি মার্টিনের সঙ্গে যেভাবে সে অবৈধ প্রেমে মেতে উঠেছিল সে কি তার মায়ের রক্তেরই প্রেরণা নয়? কাজের চাপের ফাঁকি দিয়ে এণ্টনি দু'চার দিন এমন কি সপ্তাহভর যে কোথায় গিয়ে ডুবে থাকতো কেউ তা টের পেতো না। বেশ কিছু টাকা নিয়ে আসতো এক একবার। চোরাই

টাকা। অসৎ উপায়ে উপার্জিত টাকা। অনেক সময় আবার দামী দামী মদও নিয়ে আসতো। কালী মার্কা দিশী নয়। বিলিতী অর্থাৎ বিদেশী। হুইস্কি, রেড লেবেল আর হোয়াইট লেবেল, জিন, ভারমুথ, ভ্যাট ইত্যাদি রকমারি মাল। বুড়ো ফার্লো সায়েবের পছন্দের কথা বেশ ভালো করেই জানতো এণ্টনি। আর এও জানতো যে বুড়োকে খুশি করতে পারলেই মেরিনাও খুশি। বুড়োর অনেক টাকা পয়সা ছিল এবং এসব দামী দামী মাল খেয়ে খেয়েই সে ফতুর হয়েছে এও সে শুনেছে মেরিনার কাছেই। দিনরাত নেশায় ডুবে থেকে ফার্লো সায়েব ভুলে থাকে তার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা।

এণ্টনির ঘন ঘন অনুপস্থিতির সুযোগে হ্যারির সঙ্গে মেরিনার মাখামাখি খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতেই তার বুড়ো বাপের অবস্থার কথা মনে পড়ে যায় মেরিনার। আর বেশিদূর এগুলে এণ্টনিকেও হয়তো ফার্লো সাহেবের মতোই নেশায় বুঁদ হয়েই দিন কাটাতে হবে। তাকে যে এণ্টনি সত্যি সত্যি খুব ভালোবাসে তাতে তো কোন সন্দেহই নেই মেরিনার। তাকে খুশি করার জন্যে এণ্টনির চেষ্টারও অন্ত নেই। যদিও সে চেষ্টা অসৎ পথকে আশ্রয় করে চলে তা সে জানতে পায় অল্প দিনের মধ্যেই। তা হোক গে। তার ভালবাসাকে তো সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত হ্যারির সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অল্প কিছুদিন মেলামেশার পর খুব বেশি ভালোও লাগছিল না হ্যারিকে। বড্ড যেন গোবেচারা ভাব। ছাড়াছাড়ি হওয়াতে খুশিই হয়েছে মেরিনা। তবে এই অল্পদিনের মধ্যেই সে বড়ো কম টাকা কামায় নি হ্যারির কাছ থেকে। প্রচুর টাকার প্রয়োজন তাদের। তার বুড়ো বাপের জন্যেই সে একটু বেশি টাকা মাইনের কাজ খুঁজে নিয়েছে। হোক বেশি খাটুনি, তাও ভালো।

সে আর এণ্টনি দু'জনে মিলে যদি ভালো আয় করতে পারে তা হলে বেশ ভালো ভাবেই চলে যাবে, মেরিনার এই ধারণা।

কিন্তু হঠাৎ বিপদ এসে গেলো। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট আর কি! হ্যারির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনার কয়েকদিন পরেই মেরিনা জানতে পায় এই বিপদের কথা। ক্রীক রোতে তাদের ঘর সার্চ করতে আসে পুলিশ। রাত ভোর হতেই হঠাৎ একদিন পুলিশের হাঁকাহাঁকি শুনে আতংকিত হয়ে ওঠে মেরিনা। কিন্তু খুব আশ্চর্য হয় না। আধপাগলা বুড়ো বাপ তার বিড বিড় করে গালাগাল দেয় পুলিশকে। সে বুঝতেই পারে না তার গুণধর জামাতা বাবাজা কী এমন অপরাধ করতে পারে যার জন্যে এই ঝামেলা তাদের সহ্য করতে হবে। সত্যি সত্যি দু' দুটো ঘর তছনছ করেও পুলিশ সন্দেহ করার মতো কোন কিছুর খোঁজ পায় না কোথাও। তবে কি মিছিমিছিই পুলিশ হয়রানি করছে এণ্টনিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকেও? সন্দেহ জাগে মেরিনার মনে। সে সবিনয়ে এবং ভয়ে ভয়েই জিগ্যেস করে দারোগা সায়েবকে। কিন্তু কঠোর উত্তর আসে তার কাছ থেকে। নোট জালের আড্ডায় হাতেনাতে ধরা পড়েছে এণ্টনি। এ আর মিথ্যে হতে পারে কখনো?

এণ্টনির জেল হয়ে যায় বিচারে। তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। তার একশো টাকা মাইনেতে সব খরচ সে যে কী করে চালাবে ভেবেই পায় না মেরিনা। তবে এরই মধ্যে হঠাৎ যেন তার বরাত খুলে যায়।

রেস্তোরাঁ গাল মেরিনা। রোজ কতো লোক আসে যায় তাদের ক্যাফে ডি চৌরঙ্গীতে, সবাইকে সমান সৌজন্যে সার্ব করে তারা। কাউকে ভালো লাগে, কাউকে লাগে না। তবে এই ভালো লাগা-না-লাগার

বিন্দুবিসর্গও প্রকাশ পায় না তাদের আচরণে। এমনি দশজনের একজন খদ্দের হিসেবেই একটি সুন্দর সন্ধ্যায় সেন আসে কাফে ডি চৌরঙ্গীতে। মেরিনা মার্কাসের কেমন যেন চোখ লেগে যায় এই নতুন খদ্দেরকে দেখে। রক্তে তার কেমন একটা দোলা লাগে। তার মায়ের রক্তই তার মধ্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে বুঝি! এর আগে কখনো আর আসেনি সেন এই রেস্তোরাঁয়। কী করেই বা আসবে? এই রেস্তোরাঁ সৃষ্টির আগে থেকেই তো সে জেলে জেলে। অথচ কে বলবে তাকে যে সে সদ্য জেলফেরৎ। প্রথম আলাপেই মেরিনা খুঁজে পায় তার মধ্যে তার এণ্টনিকে। এণ্টনির পৌরুষ, তার ভালবাসাকে। আলাপ গভীর থেকে গভীরতর হয়। ক্রীক রো'র বাসায় আসা যাওয়া সুরু হয়ে যায় সেনের। কাফে ডি চৌরঙ্গীর সে নিত্য খদ্দের। অন্ধ নোবেল ফার্লো একদিন জিগ্যেস করেছিল মেরিনাকে, এণ্টনি ফিরে এলো নাকি। মেরিনা উত্তর দিয়েছিল, না। তবে কোত্থেকে আবার এদ্দিন পর এতো ভালো ভালো মালের আমদানী হচ্ছে মেরিনা? মিঃ সেইন এনে দিচ্ছেন, এণ্টনিরই বন্ধু মিঃ সেন। এই বলে সেদিন তার বুড়ো বাপকে বুঝিয়ে দিয়েছিল মেরিনা। কিন্তু বুড়োর মন ভালো করে সায় দেয় নি তার কথায়। এ-ও কি ভালো বেহালা বাজায় না কি রে? নিজের বেহালা-বাদক বন্ধুর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল বুড়োর। হয়তো তার জন্যেই একটু সাবধান হয়েছিল মেরিনা। তবে সেনকে খুব শুষে নিয়েছে একটানা প্রায় আড়াই বছর ধরে। রোজগারের চৌদ্দ আনাই সেন খরচ করেছে মেরিনাকে হাতে রাখার জন্যে। সমবায় ম্যানসনের মেস তো নামেমাত্র, ক্রীক রো'র বাড়িই ছিল তার আসল ঠিকানা। আর মেরিনা এতোদিন সত্যি সত্যি তার হাতেই ছিল।

তা না জানাক। কিন্তু এতোদিন ধরে যে লোকটাকে সে এমনি

করে নিঃশেষে শোষণ করলে তাকেই কিনা সে নিজে পুলিশের হাতে তুলে দিলে! না দিয়ে উপায়ও ছিল না তার কোন।

দিন কুড়ি আগে তার নাকি হঠাৎ দেখা হয়ে যায় বর্মণের সঙ্গে। বর্মণ এখন পুলিশ ইন্সপেক্টর। তিন বছর আগে ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর। তিন বছর আগে তিনিই গ্রেপ্তার করেছিলেন এণ্টনিকে বৌবাজারে এক নোট জালের আড্ডায়। তাদের ক্রীক রো'র বাড়িতে তল্লাসীতে গিয়েছিলেন তিনি। তাইতো তাঁকে দেখেই চিনতে পারে মেরিনা। তাঁর কাছেই সে শুনতে পায় যে, এণ্টনির মুক্তি আসন্ন। আসছে মাসেই ছাড়া পাবে এণ্টনি। সচকিত হয়ে ওঠে মেরিনা। সেনের কথা মনে হয় তার সঙ্গে সঙ্গে। সেনের সমস্ত খবর যে সে রাখে সেকথা জেনেই বর্মণ খবর নিতে এসেছে তার কাছে। পুলিশের প্রশ্ন, কাজেই প্রথমটায় সে স্বীকার পেতে চায় না। কে জানে কিসে কী গণ্ডগোলের মধ্যে আবার সে নিজেও জড়িয়ে যাবে! কিন্তু বেশিক্ষণ চেপে যাওয়া সম্ভব হয় না তার পক্ষে। ইন্সপেক্টর বমণ রীতিমত ভয় দেখায় তাকে। সেনকে সে যদি ধরিয়ে না দেয় তাহলে এণ্টনি ছাড়া পাবার পরেই আবার তাকে জেলে পুরে দেওয়া হবে। আর তার নিজেরও হয়রানির অবধি থাকবে না।

মেরিনা সব বিষয় চিন্তা করে দেখার জন্যে সময় নেয় কয়েকদিনের। সেনকে ধরিয়ে দেওয়াটাই ঠিক হবে বলে সে স্থির করে। তা না হলে এণ্টনি জেল থেকে বেরিয়ে এলে একটা খুনোখুনিও হয়ে যেতে পারে। দু'টোই যে এক জাতের। অন্য কেউ না জানুক, সেতো জানে।

বর্মণের সঙ্গে পরামর্শ করেই সে ফাঁদ পাতে। নির্দিষ্ট একটা তারিখকে মেরিনা জানায় তার জন্মদিন বলে। সরল বিশ্বাসে সেন উৎসবের রূপ দিতে চায় সে জন্মদিনটিকে। মেরিনাকে আরো খুশি

করতে চায় সে। গান বাজনা পান ভোজনের রীতিমতো এক বিরাট আয়োজন হয় ক্রীক রো'র বাড়ীতে। অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বর্মণও যোগ দেন সে উৎসবে এবং অনুষ্ঠান শেষে সেনকে গ্রেপ্তার করে সকলকে অবাক করে দেন।

কি গো শেষ পর্যন্ত কি শুনলে, না ঘুমিয়েই পড়লে?—রায়ের সন্দেহ মিথ্যে নয়, গৃহিণী তাঁর ঘুমিয়েই পড়েছেন গল্প শুনতে শুনতে। মাঝে মাঝেই তিনি প্রশ্ন করছিলেন এবং নানারকম মন্তব্য করছিলেন প্রথম দিকে। তারপরে কখন যে তিনি ধীরে ধীরে ঘুমের দেশে যেয়ে পাড়ি জমিয়েছেন কে বলবে!

* * *

আরো কয়েকদিন পরের কথা। সেনের মামলা কোর্টে উঠেছে। কয়েকটা শুনানীও হয়ে গিয়েছে। কর্ণেল সিম্পসন, ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট, স্যার চার্লস টেগার্ট, রায় বাহাদুর জ্ঞান গুহ, মিঃ হার্টলি প্রভৃতি সকলেরই সাক্ষ্য নেওয়া হয়ে গেছে। নির্মলেন্দু ও তাঁর বন্ধু পাঠকের জবানবন্দী তো আগেই হয়েছে।

রায়ের দিন নির্মলেন্দু কোর্টে যেয়ে উপস্থিত হন বন্ধু পাঠককে নিয়ে। সরকারি কর্মচারীর স্বাক্ষর জাল ও প্রতারণার দায়ে দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন হাকিম। রায় শুনেই আসামীর কাঠগড়া থেকে সেন বলে ওঠে নির্মলেন্দুকে লক্ষ্য করে—

দেখুন মিঃ রায় ঠিক বলেছিলাম কিনা। আমাদের অভিজ্ঞতারও তো একটা মূল্য আছে, কী বলেন? দু'বছর বলেছিলাম, ঠিক দু'-বছরই তো হলো! আমার জীবনে এবার ভাটা চলবে দু' বছর ধরে। আবার জোয়ার আসবে! ভাববার কী আছে?

এই যে মিঃ পাঠক যে! আপনার কমিশনটা আর দেবার সুযোগ

হলো না, আর আসলেই যে গোলমাল হয়ে গেল কিনা! কী আর করবো বলুন? ক্রীক রো'র মেয়েটাই এবার ডুবিয়ে দিলে। তা না হলে আপনার সঙ্গে পার্টনারশিপে ভালো ব্যবসাই করা যেতো।

পুলিশ হাতকড়া দিয়ে সেনকে বের করে নিয়ে যায় কোর্ট থেকে। সেন অদৃশ্য হয়ে গেলেও তার অদ্ভুত কথাগুলো কোর্টভর্তি লোকের কানে বাজতে থাকে।

—"মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানে না, স্বাবলম্বন-শক্তি তাহার আসে না। এ জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে। তুমি বড়ো হইয়া দাঁড়াইবে কি ছোটো হইয়া থাকিবে, তাহা তোমারই হাতে। বিঘ্ন বাধা, পাপ-প্রলোভন, জীবনের সমস্যা, সকলেরই পথে উপস্থিত হয়। তাহার উপরে উঠা বা নীচে পড়িয়া যাওয়া, ইহার উপর বড়ো বা ছোটো হওয়া নির্ভর করে।" —শিবনাথ শাস্ত্রী

কিরণাবাসে

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

সহরের উপকণ্ঠে একটি ছোট সরকারী হাসপাতাল। অর্থাভাবে হাসপাতালটি উঠে যাবার উপক্রম হয়েছিল। জনসাধারণের অনেক আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও সরকার সেদিকে নজর দিতে পারছিলেন না। সহরের মধ্যে বড় বড় হাসপাতালে বড় নজর সর্ব্বাগ্রে দিতেই হবে সরকারকে। ছোট হাসপাতালে ছোট নজর দেবার ফুরসতই নেই কারোর। কোনও রকমে চলছিল টিম্-টিম্ করে। রোগীদের থাকবার সুবিধেও নেই—ব্যবস্থাও নেই। একজন মাইনে-করা এল্-এম্-এফ্ ডাক্তার সকাল বেলায় এসে তবু বসেন হাসপাতালের ঘর খুলে। তাঁর সঙ্গে আসে একজন কম্পাউণ্ডার। গরীব রোগীরা আসে অনেকেই। এল্-এম্-এফ্ ডাক্তার তাদের [illegible] ওষুধ দেন বেছে বেছে। এমন ওষুধ দেন—যে ওষুধ হাসপাতালে তখনও আছে; একেবারে ফুরিয়ে যায় নি। রোগীরা তাই শিশি ভরে ভরে নিয়ে যায়। যত্ন করে ওষুধ খায়। রোগ সারে—আবার সারেও না। কি করবে তারা - তারা যে নিরুপায়! নির্জ্জল দেশে পচা ডোবা যেমন করে জল সরবরাহ করে থাকে, এই হাসপাতালটি ঠিক তেমনি ভাবেই নামের মাহাত্ম্য বজায় রেখে চলছিল।

এল্-এম্-এফ্ ডাক্তারের নাম সনাতন। সনাতন সেন। বয়স হয়েছে—অভিজ্ঞতাও বেশ আছে। হাসপাতালের পাশেই ঘর ভাড়া করে থাকেন। পসার অল্প হলেও আছে কিছু। Outdoor call পান একটা আধটা। দু'টাকা ভিজিট্ নেন। চলে যায় সংসার।

সনাতন ডাক্তার কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন—আর বলা হ'ল না। ঠিক সেই সময় একখানা মটর গাড়ী হাসপাতালের চত্বরে এসে দাঁড়ালো। মটর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে ড্রাইভার কার্ত্তিককে জিজ্ঞেস করলে, এখানে ডাক্তারবাবু কে আছেন ?

সনাতন ডাক্তারকে দেখিয়ে দিয়ে কার্ত্তিক বললে, এই যে ইনি—কেন—কি হয়েছে !

ড্রাইভার বললে, Film Star বনানী বসু গাড়ীতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন—তাঁকে একবার দেখতে হবে।

Film Star বনানী বসুর নাম শুনে কার্ত্তিক একেবারে চমকে লাফিয়ে উঠল।

এ্যা—বলেন কি কোথায় তিনি—কোথায় তিনি—কি হয়েছে—কি হয়েছে তাঁর !

একটা accident ঘটেছে ঐ রাস্তাটার মোড়ে।

কার্ত্তিক বলে উঠল, এ্যা—বনানী বসুর acciden—বলেন কি ! ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু—

সনাতন ডাক্তার তাড়াতাড়ি medical journal ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দিকে চেয়ে ড্রাইভার বললে, opposite side থেকে একখানা মালবোঝাই লরী (Lorry) আসছিল একেবারে full forceএ। collision বাঁচাতে গিয়ে আমি গাড়ীটা খুব জোরে বাঁদিকে ঘুরিয়ে নিই ; নইলে গাড়ীখানা একেবারে চুরমার হয়ে যেত। তারপর একটা গাছে একটু slight ধাক্কা লাগে। সেই 'জার্ক' আর 'সকে' উনি কেমন হয়ে পড়েছেন। গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে আর সহরের মধ্যে বড় হাসপাতালে যাবার সময় নেই। আমি তাই লোককে জিজ্ঞেস করে

এই হাসপাতালেই তাড়াতাড়ি নিয়ে এলুম। আপনি, ডাক্তারবাবু, first aid দিয়ে দেখুন।

কথাগুলো ড্রাইভার বলে গেল সনাতন ডাক্তারকে গাড়ীর কাছে নিয়ে যেতে যেতে। সর্ব্বাগ্রে এক রকম ছুটে চলেছে কার্ত্তিক।

গাড়ীর ভিতর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসে আছেন ছায়া-তারকা বনানী বসু। হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা পায়ের কাছে ছিটকে পড়ে আছে হতাশ-প্রেমিক নায়কের মতন। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে বনানী বসুর। চোখ বুজে আছেন। নাকে একটা হীরের নাকছাবি চকমক্ করছে। পরণে একখানা সাদাসিধে সিল্কের শাড়ী হাল্কা গোলাপি রঙের সায়ার ওপর। গায়ের ওপর-ভাগে একটা দামী অর্গাণ্ডির নক্সা-করা ব্লাউজ। সায়া আর ব্লাউজের পরস্পর প্রান্তভাগে মিলন হয় নি। মিলন হতে পারেও নি। অমিলনে দেহশ্রী উঁকিঝুঁকি মারছে। হাতের দু'আঙুলে দুটি আংটি—একটি দামী পোখরাজের আর একটি পান্নার। এক ছড়া সরু সোনার হার ঝুলছে গলায়। নীচের দু'হাতে মাত্র দু'গাছি করে সোনার চুড়ি।

সনাতন ডাক্তার মোটরের কাছে এসে দাঁড়াতেই একটা দামী সেণ্টের সুবাস ভেসে এল তাঁর নাকে।

বনানী বসু ধীরে ধীরে বললেন, বুকটার ভেতর কি রকম করছে যেন ডাক্তারবাবু, থরথর্ করে এখনও যেন কাঁপছে—কিছু বলতে পারছি না মুখে। যা হয় করুন। ওঃ! আজ সকালে কি বিপদই গেল আমার!

সনাতন ডাক্তার আশ্বাস দিয়ে বলে উঠলেন, কোন ভয় নেই—কোন ভয় নেই আপনার। আমি সব পরীক্ষা করে দেখছি। আপনাকে একবার ধীরে ধীরে নেমে আসতে হবে যে। কার্ত্তিক—কার্ত্তিক—

তারপর সকলে ধরাধরি করে বনানী বসুকে মোটর থেকে নামালে। ইতিমধ্যে হাসপাতালের সামনে বেশ ভিড় জমে গেছে। মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে ও-তল্লাটে। ছেলে বুড়ো সব ছুটে এসেছে দেখতে। বনানী বসুর এ-বিপদে সাহায্য করবার জন্যে সকলেই ব্যস্ত। একটু কিছু করতে পারলেই যেন তারা কৃতকৃতার্থ হয়। মুখে 'আহা — আহা' করছে সকলেই। কার্ত্তিক ছুটে গিয়ে একখানা হাত-পাখা নিয়ে এল। বনানী বসুর মাথায় ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করতে লাগলো।

সনাতন ডাক্তার হাসপাতালের ঘরের মধ্যে বনানী বসুকে নিয়ে গিয়ে একটা বেঞ্চের ওপর শুইয়ে দিলেন। বনানী বসুর ভ্যানিটি ব্যাগটা ড্রাইভার হাতে করে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বনানী বসু হঠাৎ বিরক্তি প্রকাশ করে বলে উঠলেন, আঃ! এখানে এত ভিড় কেন ?

পরক্ষণেই কার্ত্তিক গর্জ্জে উঠল।

আপনারা সরে যান —সরে যান একটু। ডাক্তারবাবুকে রোগী দেখতে দিন আগে।

সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কার্ত্তিকও এল।

সনাতন ডাক্তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেশ নিবিষ্ট মনে বনানী বসুকে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

কার্ত্তিক জিজ্ঞেস করলে ড্রাইভারকে, কোথায় যাচ্ছিলেন ইনি ?

ড্রাইভার বললে, যাচ্ছিলেন দত্তপুকুরে। ঐখানে এক বাগান-বাড়ীতে ছবির সুটিং তোলা হচ্ছে কি না আজ ক'দিন।

জনতার মধ্য থেকে হঠাৎ একজন যুবক হাতের attache caseটা

তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েছে, মশাই -কি হয়েছে? আমি খবরের কাগজের reporter—শুনছি না কি film actress বনানী বসু -

কথাটায় বাধা দিয়ে কে একজন সখেদে বলে উঠল, expired

খবরের কাগজের reporter যিনি---তিনি চোখের তারা কপালে তুলে একেবারে সবিস্ময়ে আঁতকে উঠে বললেন, এ্যা! বলেন কি --সে কি- -কি হয়েছিল --কি হয়েছিল--

কার্ত্তিক জোর-গলায় সকলকে শুনিয়ে বলতে লাগলো বার বার, না-না--তেমন কিছু হয় নি। ডাক্তারবাবু তাঁকে examine করছেন। আপনারা স্থির হন্ একটু - অমন ব্যস্ত হবেন না।

এই ঘটনার ছ'মাস পরে হাসপাতালের চেহারা গেল ফিরে। বনানী বসু সুস্থ হয়ে উঠলেন। একটা আকস্মিক নিদারুণ shock-এ ও-রকম হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সনাতন ডাক্তার খুব যত্ন করে তাঁকে দেখেছিলেন। আবশ্যক ওষুধপত্র তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে না থাকলেও সনাতন ডাক্তার কার্ত্তিককে দিয়ে কিনিয়ে আনিয়েছিলেন। কেমন দৈব অনুকূল হ'ল হাসপাতালের। পরে সমস্ত অবস্থা শুনে বনানী বসু সনাতন ডাক্তারের হাতে হাসপাতালের উন্নতির জন্যে এককালীন নগদ ত্রিশ হাজার টাকা দান করলেন। পরে আরও কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। খবরের কাগজে দানের মাহাত্ম্য যথারীতি ঘোষিত হ'ল। নজর পড়ল সরকারের। বনানী বসুর দানে ও কর্তৃপক্ষের কিঞ্চিৎ সাহায্যে হাসপাতালের নব-কলেবর-উৎসব হ'ল। নামকরণ হ'ল হাসপাতালের—'কিরণাবাস'। এই কিরণাবাস গড়ে তুলতে সনাতন ডাক্তার নবোদ্যমে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।

বনানী বসুর পূর্ব্ব-আশ্রমের নাম ছিল কিরণময়ী। তারপর অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ও ঘটনা-সংঘাতে কিরণময়ী বদলে যায় একেবারে যশস্বিনী ছায়া-তারকা সুন্দরী বনানী বসুতে। 'কিরণময়ী' নামে যা' আসে নি—তা' এল 'বনানী বসু' নামে। এল অপর্য্যাপ্ত অর্থ এল প্রভূত খ্যাতি চিত্রজগতে। সেই 'কিরণময়ী' নামের ওপর বনানী বসুর অর্থে গড়ে উঠল একদিন এই কিরণাবাস হাসপাতাল। মোটা মাইনেতে বড় ডিগ্রিধারী ডাক্তার এসে বসলেন হাউস সার্জ্জেন হয়ে কিরণাবাসে। সনাতন ডাক্তারও রইলেন দেখা-শোনা করতে। ব্যবস্থা হ'ল রোগীদের স্থায়ীভাবে থাকবার। চিকিৎসার মান গেল বেড়ে। কেবল থাকতে পারলে না কম্পাউণ্ডার কার্ত্তিক জানা। সত্যিই সে পরে film artist হয়ে পড়লো। প্রায় পনের বছর আগের ঘটনা এই। কিরণাবাস গড়ে উঠতে বনানী বসুর নামে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল চারিধারে।

পনের বছরে অদল বদল হ'ল অনেক কিছু। পরাধীন দেশ হ'ল স্বাধীন। এল একটা গোলমেলে হাওয়া কোন-কিছু-না-মানার যুগ। কিরণাবাসে এখন আর নেই সেই সনাতন ডাক্তার। মরে গেছেন তিনি অনেকদিন। কিরণাবাসের কর্ম্মকর্ত্তারা সব নতুন। বনানী বসুর নাম নেই আর। কোন ছায়াচিত্রে নামেন না আর তিনি। বছর পনের আগে বনানী বসুর আসে এক বৈরাগ্য। ছেড়ে ছুড়ে দেন সব। আর ভালো তাঁর লাগলো না কিছু। টুটে গেল নেশা—পেশা গেল ভেঙে। হয়তো তাঁর ভোগজীবনে এসেছিল অরুচি। হয়তো তাঁরে বারে বারে দিয়েছিল খোঁচা এমন একটা কিছু যার কথা তিনিই জানতেন। কিংবা হয়তো বুঝেছিলেন তিনি, বসনে ভূষণে

চিরকাল বাঁধা থাকে না নারীর যৌবনসৌন্দর্য্য। তাই তিনি সঙ্গোপনে গুটিয়ে নিলেন জাল। সব বেচে দিয়ে উঠলেন গিয়ে কাশীধামে।

তারপর চলে আসছে কিরণাবাসের দৈনন্দিন কাজ।

ডাক্তার চৌধুরী হলেন 'হাউস্ সার্জ্জেন'---বিলিতি ডিগ্রি আছে ডাক্তার চৌধুরীর। থাকেন পাশেই কোয়ার্টার্সে। থাকেন তাঁর স্ত্রী মিসেস চৌধুরী। 'মেম সাব' ব'লে না ডাকলে তিনি ভ্রূকুটী করেন। চালচলন সাহেবী ধরণের। ডাক্তার চৌধুরী সময় মত হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। নার্স আছে সুইপার আছে-- আছে চাকর কুলি। রোগী আসে যায়। অকারণে খায় ভর্ৎসনা তিরস্কার। Bed খালি পাওয়া যায় না। ডাক্তার চৌধুরীর করুণা না হলে কোথাও কিছু হবার জো নেই। তিনি যাকে সুপারিশ করবেন তারই বরাত হয় সুপ্রসন্ন। অন্যথায় 'হা হতোঽস্মি' অবস্থা।

আউট্‌ডোরে ডাক্তার চৌধুরী রোগী দেখতে এলে সবাই ভয়ে থাকে আড়ষ্ট হয়ে। দেখতে দেখতে খিঁচিয়ে ওঠেন ডাক্তার চৌধুরী। বলেন---না-না এখানে bed নেই---bed নেই---অন্য হাসপাতালে দেখ গে।

তারপর আর একজনের কথা শুনে বলে ওঠেন, হবে না---হবে না-- ও সব দামী ওষুধ এখানে পাওয়া যাবে না। বাইরে থেকে কিনে আনতে হবে।

হাতঘড়ি দেখেন---সকাল দশটা বেজে গেছে। হুকুম দেন---দরজা বন্ধ করে দিতে। অনেক দূর থেকে কিরণাবাসের নাম শুনে রোগী এসেছে দেখাতে। তাকে হাঁকিয়ে দেন ডাক্তার চৌধুরী। বলে দেন কাল আসতে সকাল আটটায়---যখন তখন রোগী দেখা চল্‌বে না।

লোকেরা বলাবলি করে, কৈ—সনাতন ডাক্তারের বেলায় তো এমনটি হ'ত না।

সেদিন কিরণাবাসের দোতলায় বড় ঘরখানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। ডাক্তার চৌধুরীর শালী আসবেন। তাঁর হাতের আঙুলে নোক-কুনি হয়েছে—operation করতে হবে। আগে থাকতে কথাবার্ত্তা ঠিক হয়ে আছে। সকাল ন'টায় আসবার কথা। এখনও এলেন না কেন! আসছেন তিনি খড়্গপুর থেকে তাঁর স্বামীর সঙ্গে। ভগ্নীপতির কাছেই তিনি চিকিৎসা করাবেন। অন্য কোথাও তাঁর ভরসা হয় না। মিসেস চৌধুরী অর্থাৎ 'মেম সাব' ঘর-বার করছেন—তাঁর বোন কখন আসে কখন আসে। ডাক্তার চৌধুরীকে তাগাদা দিতে হাওড়া ষ্টেশনে 'ফোন্' করে জানা হয়ে গেছে এরির মধ্যে তিনবার। জেনেছেন ট্রেণ লেট আছে—এখনও এসে পৌছয় নি।

ঠিক এমন সময় একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো কিরণাবাসের ফটকে। তা'থেকে ধীরে ধীরে নেমে দাঁড়ালেন একজন প্রৌঢ়া থান-ধুতি পরে। সঙ্গে একজন দাসী ও একজন চাকর।

ডাক্তার চৌধুরী বলে রেখেছিলেন, তাঁর আত্মীয়রা আসবেন। তাই কর্ম্মচারীরা অতি যত্নে তাঁদের নীচের ঘরে এনে বসালে।

খবর পেয়ে ডাক্তার চৌধুরী ছুটে এলেন। ভেবেছিলেন বুঝি তাঁর শালীই এসেছেন। বিরক্ত হয়ে বললেন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে, ইঁহা কাহে লে আয়া? হামরা কুঠীমে কাহে নেহি পয়লা লে গিয়া? Nonsense!

ঘরের ভিতর ঢুকে ডাক্তার চৌধুরী সকলকে দেখে একেবারে আগুন

হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন পরুষ কণ্ঠে, কি চাই—এখানে কি প্রয়োজন ?

দাসী বললে, বাবা—এঁর জন্যে এসেছি। আজ দু'মাস পেটের যাতনায় বড় কষ্ট পাচ্ছেন।

গর্জ্জন করে উঠলেন ডাক্তার চৌধুরী, তা আমি কি করবো ?

প্রৌঢ়া যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছেন। তিনি কথা বলতে পারছেন না। পেটে হাত দিয়ে বসে আছেন। অতি কষ্টে একবার মুখ তুলে ডাক্তার চৌধুরীর মুখের পানে চেয়ে দেখলেন।

দাসী বললে, ওখানে বাবা ডাক্তার দেখিয়েছিলুম— তাঁরা বলেন—পেটের মধ্যে ফোড়া হয়েছে—কাটতে হবে। তাই মা বললেন— মরি যদি কিরণাবাসেই মরব— আমায় নিয়ে চল্, সরলা।

এমন সময় হাওড়া ষ্টেশন থেকে ট্যাক্সি করে ডাক্তার চৌধুরীর শালী এসে কুঠীতে উঠলেন। পূর্ব্বে তিনি এসেছিলেন দু'তিন বার।

ডাক্তার চৌধুরী তা' লক্ষ্য করে আর শুনতে চাইলেন না সরলা দাসীর কথা। উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, না-না—এখানে হবে না। এখানে 'বেড্' নেই। অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাও রুগীকে।

এই কথা বলতে বলতে ডাক্তার চৌধুরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন নিজের শালীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। প্রৌঢ়া অতি কষ্টে চেয়ে দেখলেন একবার ডাক্তার চৌধুরীর পেছন দিকটা।

তারপর একজন নার্স ঢুকল ঘরের ভেতর। হাসি-হাসি মুখ—মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা। ডাক্তার চৌধুরীর বিশেষ প্রিয়পাত্রী সে। ডাক্তার চৌধুরীর শালীর জন্যে ওপরের ঘর ঠিক করতে তাকে খবর পাঠিয়েছেন।

নার্স বললে, তোমরা বাছা, অন্য হাসপাতালে এইবেলা চলে যাও। এখানে জায়গা নেই। ডাক্তারবাবু বলে দিলেন।

প্রৌঢ়া সরলার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন নার্সের কথাটা শুনে।

বললেন সরলাকে, তাই চ' সরলা—আমায় অন্য হাসপাতালে নিয়ে চল্। এখানে আর দরকার নেই। বড় ভুল করে এখানে এসেছিলুম।

প্রৌঢ়ার হাত ধরে সরলা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরের হল-ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াতেই দারোয়ান হাতরুখে নিষেধ করলে। ডাক্তার চৌধুরী আসছেন হাসতে হাসতে কথা কইতে কইতে তাঁর নবাগতা শালীর সঙ্গে। পিছনে আসছেন মিসেস্ চৌধুরী—তাঁরও বেশ হাসি-হাসি মুখ। হল-ঘরের সামনে দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। তাঁরা সকলে যাবেন ওপরের ঘরে - ডাক্তার চৌধুরী তাঁর শালীর আঙুলের নোকের পাশটা একটু চিরে দেবেন ছুরি দিয়ে।

প্রৌঢ়া আর দাঁড়াতে পারলেন না। পাশেই একখানা রোগীদের বসবার 'বেঞ্চ' ছিল—তাইতে বসে পড়লেন। বসে থাকতেও আর পারলেন না। পেটের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি ধীরে ধীরে বেঞ্চের ওপরই সরলার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে জনসাধারণকে জানানো হ'ল এই যে, 'কিরণাবাসের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী কিরণময়ী দীর্ঘকাল পরে গত সকাল বেলা চিকিৎসার জন্য কাশী হইতে বরাবর কিরণা-বাসে চলিয়া আসেন তাঁহার দাসী সরলাকে সঙ্গে লইয়া। তাঁহার

উদরের মধ্যে ফোড়া হইয়াছিল। বহু দিন তিনি ঐ রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার সেবাশুশ্রূষার কোন ত্রুটি হয় নাই। ডাক্তার চৌধুরী তাঁহার চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন এবং মিসেস্ চৌধুরীও অন্যান্য নার্সদের সঙ্গে তাহার সেবারতা ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় —শ্রীমতী কিরণ্ময়ী গত কাল রাত প্রায় তিনটার সময় হঠাৎ মারা যান্। কিরণ্ময়ীর প্রতি কিরণাবাসের কর্তৃপক্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন এবং স্বয়ং মিসেস্ চৌধুরী কিরণ্ময়ীর মৃতদেহ স্বহস্তে পুষ্পমাল্যে ভূষিত ও চন্দনচর্চ্চিত করিয়া দেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—কিরণ্ময়ীর আত্মা শান্তি লাভ করুক।'

অতীব সুখের বিষয়, কিরণ্ময়ীর দাসী সরলা নিরক্ষরা : খবরের কাগজ সে পড়তে জানেও না— পারেও না।

—"পণ্ডিত আর সাধু অনেক তফাৎ। শুধু পণ্ডিত যে, তার কামিনী কাঞ্চনে মন আছে। সাধুর মন হরিপাদপদ্মে। পণ্ডিত বলে এক আর করে এক। সাধুর কথা ছেড়ে দাও। যাদের হরিপাদপদ্মে মন তাদের কাজ, কথা সব আলাদা।" —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

উত্তর সাগরের তীরে

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

এক

নিস্তব্ধ নির্জন রাজগীরের পঞ্চচূড় পাহাড়। আবছা অন্ধকারে তারা যেন পঞ্চ প্রহরীর মত স্থির নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে। ডিসেম্বরের দারুণ ঠাণ্ডায় পথে ঘাটে লোকজন আজ একেবারেই নেই। যাত্রীদের ভীড়ে আর ব্যবসার ফিকিরে আসা নানান লোকের গোলমালে দিনের বেলা যে রাজগীর হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল - সে যেন এখন খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। কেবলমাত্র আমিই একলা পাহাড়ে পথ দিয়ে সটান চলে যাচ্ছিলাম গাঁয়ের বাজারের দিকে। কতো রাত হয়েছে খেয়াল করিনি। মানুষকে যখন নিশির ডাকে পায়, তখন সে ঘুমের ঘোরে পথ চলে— কথা বলে সব কিছু করে। হঠাৎ খেয়াল হয় যখন সে ঘোর ভাঙে। আজ আমারও অবস্থা প্রায় সেই রকম।

আজ সন্ধ্যাবেলা জ্যাককে বৌদ্ধ শ্রমণের বেশে দেখা থেকে আমি যেন নিশির ডাক শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। অভ্যস্ত পথ অতিক্রম করেছি স্বপ্নের ঘোরে। মাঝে মাঝে ঘোর কেটেছে রাস্তার ধারের নিশাচর কুকুরদের তীক্ষ্ণ চীৎকারে। কিন্তু আবার ডুবে গেছি সেই স্বপ্নের মধ্যে পরমুহূর্তেই দেখি কোন কথাই মন আমার হারায়নি। অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলি—অতি সূক্ষ্ম মনমানসিকতার প্রকাশগুলিও সে সযত্নে তুলে রেখে দিয়েছিল। এতক্ষণ সেই স্বপ্নের ভিতরই দেখতে দেখতে এলাম আমার লণ্ডন থেকে আবার্ডিনের আসার যাত্রাপথ। দেখলাম সেই

রহস্যময় পুরু লেন্সের চশমা চোখে দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার যুবকটীকে, দেখলাম সেই রাতের আঁধারে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা মেয়েটীকে, দেখলাম থেরেসাকে। আবার দেখা হল মিসেস মরিসনের বাড়ীর বোর্ডারদের সঙ্গে। আর যার কথা আমার সমস্ত জীবনে একটা বিশেষ সঞ্চয় হয়ে আছে সেই শুদ্ধসত্বকেও দেখতে লাগলাম তার সেই পূর্ব পারিপার্শ্বিকের মধ্যে।

আজ এই অনাবৃত আকাশের তলায়—অবারিত পর্বত প্রান্তরের প্রশান্ত সান্নিধ্যে—পরম নিস্তব্ধ রাতে মন যেন আমার ধ্যানের আসন পেতে বসেছে। ধ্যাননেত্রে দেখছি উত্তর সাগরের তীরকে। দেখছি তার সমুদ্রমেখলা বন-গিরি-কান্তার-পরিবেষ্টিত প্রকৃতিকে। দেখছি তার নানান বৈচিত্র্যে আর মনোভাবে গড়া মানব প্রকৃতিকে।

এই কথা কটাই শেষ পর্যন্ত আমার সম্বল হল—জ্যাকের কথাগুলো যেন কানে আমার নতুন করে বাজতে লাগল। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ তাহলে জ্যাককে শান্তির পথ দেখিয়েছে। প্রোফেসর ম্যাকিণ্টর আলোচনার কোন ফাঁকে কোন কথা বলেছিলেন সেইটাই শেষ পর্যন্ত জ্যাকের জীবনে সম্বল হয়ে গেল। জ্যাকের জীবনের যে সামান্য খণ্ড-কালটুকুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল—সেটাকে আবার আমি আগা-গোড়া বিচার করতে লাগলাম। দেখলাম মানুষের সারা জীবনটাই হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তুতি। দৈনন্দিন জীবনের কর্মচাঞ্চল্যের ঘাত-প্রতিঘাতে, নিত্যনৈমিত্তিক সুখ দুঃখ—আনন্দ বেদনার বিপরীত বারি সিঞ্চনে মানুষের সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। তখন তাতে কোথা কেমন করে যে বীজটী উড়ে এসে পড়ে কেউ বলতে পারে না। সেটা মনে পড়ে তখন যখন দেখা যায় সেই বীজ অঙ্কুরে রূপ নিয়েছে। জ্যাকের জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। জ্যাক মনে মনে একদিন

পথ খুঁজেছিল। আমার সঙ্গে আলাপের সময় প্রায়ই সে বলত—আচ্ছা বোধি, তুমি তো ভারতের লোক—এমনিতেই দার্শনিক। বলত মানুষের পৃথিবীতে আসার দরকারটা কী ছিল? যখনই ভাবি—এই খাচ্ছি—পড়াশুনো করছি—বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প আড্ডা দিচ্ছি—ব্যস এই কী সব? এসবের ভেতর সত্যি যে কোন অর্থ আছে এ আমি মাঝে মাঝে বুঝতে পারি না। সব কিছু এক এক সময়ে ভারি তেতো বলে মনে হয়।

আর একদিনের কথা আমার মনে পড়ল যেদিন অদ্রে তাকে প্রত্যাখ্যান করে সেদিনকার কথা। আর অদ্রের প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করলাম—জ্যাকের মুখে শোনা তার আত্মকাহিনী। জীবনে জ্যাক কখনও ভালবাসা পেল না। যারা তার কাছে এসেছিল সবাই তাকে ছলনাই করে গেল। কিন্তু ভারী আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে জ্যাক কোনদিন ভালবাসতে কসুর করেনি। কিছু সে পায়নি বটে কিন্তু তাতে তার দেবার ইচ্ছে কোনদিন কমেনি। বরঞ্চ বেড়েই গেছে উত্তরোত্তর। আমি বার বার অবাক হয়ে ভেবেছি জ্যাকের এই ভালবাসার আসল উৎসটা কোথায়?

মনে পড়ল আমার সেদিনটার কথা। সেটা বোধ হয় নভেম্বরের একেবারে শেষের দিকের একটা দিন ছিল। তখনও আমি মিসেস মরিসনের বাড়ীর বোর্ডার। সবে সন্ধ্যেবেলায় হাই-টীতে বসব এমন সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল ঝন্ ঝন্ করে। তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে সাড়া দিতেই ওপার থেকে প্রশ্ন এলো—আপনি কী মিঃ মৈত্রেয়? বললাম—হাঁ। কিন্তু আপনি কে? কী জন্য আমাকে খুঁজছেন?

আবার জবাব এলো—আমি কে সে পরিচয় টেলিফোনে দেবো না। মুখোমুখি বসে মুখ দেখতে দেখতে কথা না বললে কী পরিচয় দেওয়া যায়? না দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? তার চাইতে আসুন একটু পরে ক্যালিডোনিয়ান হোটেলে। সেখানে আলাপ করব। আর যে জন্যে আপনাকে খুঁজছি তা সাক্ষাতেই বলব। আমার কিন্তু ভারী মজা লাগল। বার বার ভাবলাম কে এই ভদ্রলোক। এখানে আমার এই কদিনে এমন কোন লোকের সঙ্গে তো আলাপ হয়নি যে আমার সঙ্গে এমন রসিকতা করতে পারে। ব্যাপারটিকে নিছক একটা রসিকতা বলেই মনে হয়েছিল আমার।

তাড়াতাড়ি হাই-টী সেরে চলে এলাম ক্যালিডোনিয়ান হোটেলে। আবার্ডিনের বিখ্যাত হোটেল হল এইটী। এসে সরাসরি হোটেলে না ঢুকে তার সামনের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালাম। মিনিট দুই পরেই যে ভদ্রলোক হঠাৎ এসে আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন—তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। এ যে সেই লণ্ডন থেকে গ্লাসগো আসবার পথে কোচের মধ্যে দেখা আমার সহযাত্রীটী। বলিষ্ঠ হাতের চাপ দিয়ে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন—গুড্ ইভ্নিং, হা-ডু-ডু? আমাকে চিনতে পারছো তো? বললাম—তাতো পারছি। কিন্তু—

—কিন্তু কি? খুব অবাক হয়েছ নয়? তোমার ঠিকানা পেলাম কোথা থেকে?

দেখি সেই পুরু লেন্সের চশমা-পরা ছোট ছোট চোখ দুটো একটা যেন মজা পেয়ে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। মুখের সেই শিশুসুলভ ভাবটা আবার খেলা করছে।

আমাকে নির্বাক থাকতে দেখেই ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে উঠলেন। একেবারে দমকে দমকে হাসতে লাগলেন। বললেন—

দেখো তুমি তো আমার কিছুই জানো না। আমি তোমার সব খবরই রাখি। তা এসো হোটেলে বসে কিছু খাওয়া যাক।

বললাম, না। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন, কেন? বললাম, তোমার আলাপ তো হয়েছে একতরফা। তুমি আমার সবই জান— কিন্তু আমি তো তোমার নামটা পর্যন্ত জানি না। কাজেই আমি তোমার ফ্রেণ্ড হলেও তুমি আমার ফ্রেণ্ড তো নও। কী করে তোমার নিমন্ত্রণ নিই বল? দেখি তার অত হাসিখুসি ভরা মুখটা ঝট্ করে শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল—দুঃখিত, দুঃখিত - ভারী দুঃখিত আমি। তুমি কিছু মনে কোরো না প্লিজ। দেখো মজা করতে পারলে আমি দুনিয়ায় আর কিছুটী চাইনে। আর তার জন্যে কতো লোককে যে চটিয়ে দিই তারও ঠিক নেই। যাক গে—আমার নাম হল জন ম্যাকফারসন। জ্যাক বলে তুমি আমায় ডাকতে পার। আরে এসো এসো—ভেতরে এসো। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো বলে দুজন ফ্রেণ্ডকে সঙ্গে এনেছি দেখবে চল। বলতে বলতে জ্যাক কাঁচের দরজা ঠেলে আমাকে নিয়ে হুড়মুড় করে হোটেলের ভেতর ঢুকে পড়ল। দেখি সামনের ওয়েটিং বক্সে কতকগুলি মেয়ে পুরুষ বসে আছে—দেখে মনে হল বন্ধু-বান্ধবীর জন্য প্রতীক্ষমান। তাদের মধ্যে এক জোড়া যুবক-যুবতী উঠে এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। জ্যাক আলাপ করিয়ে দিল। এ হল জেমস্ রবার্টসন, সোজাসুজি জিমি। আর এই হল জিমির বান্ধবী আলেক্স্ ফ্রেজার—ভারি মিষ্টি আর ভাল মেয়ে। পরিচয় হলেই বুঝতে পারবে। জিমি আর আলেক্স্‌কে এক সঙ্গে দেখে কিন্তু হাসি পেল। জিমি হল রোগা আর বেঁটে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এক মাথা রুক্ষ এলোমেলো সোনালী চুল। আর আলেক্স্ হল সাড়ে পাঁচ ফুটের কাছাকাছি। ভারী গড়ন;

চওড়া চওড়া হাড়। বড় সড় ভরাট মুখে বড় বড় ভাসা ভাসা দুটো চোখ। ঠোঁট দুটো পাতলা আর আশ্চর্য রকমে অভিব্যক্তিব্যঞ্জক। সে দুটো সব সময়েই হাসি-ভরা থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম আলেক্স্-এর চোখ আর ঠোঁট সব সময়েই হাসে। কিন্তু প্রথম দর্শনেই এ হাসি যেন আমার আনন্দের হাসি বলে মনে হয়নি। মনে হল যেন এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে কোন গভীর কান্না।

যাই হোক হোটেলের একটা কোণ নিয়ে ক'জনে বসে পড়লাম। সামান্য কিছু দিয়ে শুরু করে কফিতে এলাম। গল্প চলতে লাগল। জিমির পরিচয় পেলাম। জিমি হল কবি। ইলিয়ট-উত্তর যুগের কাব্য তার আদর্শ। লরেন্স অডেনের ছাঁদে কাব্য লেখে। জিমির অন্য একটা পরিচয়ও পেলাম--সে হল মিসেস মরিসনের ভাইপো। যদিও মিসেস মরিসনের ওখানে তাকে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ল না তবুও শুনলাম আমাকে ও আগে দেখেছে। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল-- আমার ঠিকানা জ্যাক সংগ্রহ করেছে জিমির কাছ থেকে।

জ্যাক বলল---মিষ্টার মৈত্রেয় একজন কাব্য-ভক্ত লোক। ইণ্ডিয়ান পোয়েট টেগোরের বাড়ীর কাছে ওর বাড়ী। কলকাতাতে। আমি ওকে আজ ডেকেছি এখানে রবীন্দ্র-কাব্যের সম্বন্ধে কিছু শুনব বলে। অফ্ অল টেগোরকে আমার ভারী ভাল লাগে।

বললাম---মিষ্টার রবার্টসন, মিস্ ফ্রেজার---আপনারা নিশ্চয়ই টেগোর পড়েছেন। কেমন লাগে ?

আলেক্স্ তার মিষ্টি গলায় স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসি হাসতে হাসতে বলল---কবিতা আমি খুব বেশী পড়ি না। বুঝতে পারি না বলে। কাজেই আমার মতামত গৌণ। ওই কবিকেই জিজ্ঞাসা করুন তাঁর মত কী ?

জিমি বলল – টেগোর আমি পড়েছি। তারপর গলার আওয়াজ যথাসম্ভব নিরাসক্ত করে বলে উঠল - হ্যাঁ তা মন্দ লাগে না। তবে সত্যি কথা বলতে কি বড্ড বেশী ভাবালুস। মানে এক কথায় বলা যায় টেগোর হল ভিক্টোরিয়ান রোমান্টিসিজ্মের বোধ হয় শেষ কবি। অবশ্য তার পরে কাব্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কাব্যের ধারা একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পথ নিয়েই চলেছে এখন আমাদের দেশে –বোধ হয় ইণ্ডিয়াতেও।

সত্যি কথা বলতে কী জিমির কথাগুলো ঠিক হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারলাম না। তাই বললাম উন্নতি হয়েছে বলছেন সেটা কোন দিক থেকে?

জিমি বলল - কেন আপনিও কী বুঝতে পারছেন না উন্নতি কোথায় হয়েছে। রোমান্টিসিজ্ম্-এর যগ এখন পুরোনো বাসি হয়ে গেছে। ও দিয়ে আর কাব্য লেখা চলে না। টমাস-লরেন্স-অডেন নতুন পথ দেখিয়েছেন কাব্যের। এখনকার কাব্য হল সব ইঙ্গিত-ধর্মী সিম্বলিক। এখনকার কাব্যে তাই দেখতে পাবেন ইন্টেলেকচুয়াল- সিম্বলের কী রকম যথাযথ প্রয়োগ।

জ্যাক বলল জিমি, কবিতা সব যুগে সব কালেই ইঙ্গিত-ধর্মী। ওটা আর বিশেষ কী হল?

জিমি জবাব দিল—টেক্নিকে আর ভাষায় যে পার্থক্য সেটাই বলছি। এখনকার যুগের কাব্যের প্রকাশটাই হয়েছে অনেক তফাৎ।

বললাম কিন্তু ভাষায় যে ইঙ্গিত প্রয়োগ সেটা তো বাহ্যিক ব্যাপার। আর কটা লোকই বা সেটা বুঝতে পারে বলুন তো? ব্যক্তিগত বা একটা দলগত কালচারের মধ্যেই সে কবিতার তাৎপর্য উপলব্ধি হয় তার বাইরে নয়।

জিমি বলল—তার বাইরে যাবার দরকারও নেই।

জ্যাক আমাদের কথায় বাধা দিল—এ নিয়ে বৃথা তর্কে লাভ নেই। শেষ পর্যন্ত হয়তো আলোচনা গণ-সাহিত্য বা গোষ্ঠিগত সাহিত্যে এসে ঠেকবে। ওটাকে আমি ভয়ানক ভয় করি।

বললাম—ও-সব কথা বুঝি না। আমি কেবল মনে করি সেই কাব্য বা সেই সাহিত্য সবচেয়ে বেশী উন্নত- যে সব কালে অনেক মানুষের মন একসঙ্গে কেড়ে নিতে পারে। আর তৈরী করতে পারে নিজের আসন বহুদিন ধরে। আসলে পাণ্ডিত্য আর কাব্য-ধর্ম এক জিনিষ নয়। আজকালকার কবিরা এই পাণ্ডিত্যকেই কবিত্ব বলে ভুল করেন। যাকে আপনারা বলেন 'ক্লেভার এ্যাপ্লিকেশন' তা যতই ক্লেভার হোক না কেন যদি তা বেশীর ভাগ লোকের কাছে দুর্বোধ্য থেকে যায় তবে তাকে আমি উন্নত সাহিত্য বলতে রাজী নই।

জ্যাক বলল- ছাড় ও-সব কথা। তর্কের মধ্যে কাব্য উপভোগ করবার যে সূক্ষ্ম ইচ্ছাটুকু মনে এসেছিল সব উবে গেল। আমারই ভুল হয়েছে। জিমি, তোমাকে আজ এখানে না নিয়ে এলেই পারতাম। জানি তো তুমি শেলী বলতে ঠোঁট কোঁচকাও, বায়রণ-টেনিসনের নামে উপহাসের হাসি হাস। সেক্সপীয়রকেও মাঝে মাঝে বিদ্রূপ করতে ছাড় না।

জিমি হি হি করে হাসতে লাগল। বলল—কাব্য লেখা কী অত সহজ? পড়ে দেখো আমার Gentle Craftsman! যদি সবটা বুঝতে পার তবে বলব তোমার অক্সফোর্ডে পড়া সার্থক হয়েছে। উঁচু দরের কবিতা বুঝতে হলে অনেক উঁচু কালচার চাই, ইন্টেলেক্ট চাই। ও যার তার কাজ নয়।

জ্যাক আমার মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। মুখটা

নীচু করে বসে একমনে কী যেন দেখতে লাগল কফির পেয়ালায়। আলেক্‌স্‌ আমাদের উদ্ধার করল এই বিদ্‌ঘুটে পরিস্থিতি থেকে। বলল--জ্যাক তুমি মৈত্রেয়কে নিয়ে একদিন আমার বাড়ী এসো না। ওঁর কাছ থেকে টেগোরের কাব্য শুনব। অবশ্য আমি তো কবিতার কিছু বুঝিনে--যাই হোক তোমরা আমায় বুঝিয়ে দেবে। তবে এসো একদিন নির্ঘাৎ কেমন? আর জ্যাক তুমি মৈত্রেয়কে নিয়ে এসো আমাদের ইউনিভার্সিটি ষ্টুডেণ্ট্‌স্‌ ইউনিয়নে, সেখানে ওঁর সঙ্গে অনেকের আলাপ হবে। এখানে এসেছেন এতদিন হয়তো সঙ্গী-সাথী ওঁর কিছুই জোটেনি। আমাদের স্কটল্যাণ্ডের লোকগুলো যা গোমড়া-মুখো। তারপর আবার মিষ্টি হেসে একটা নোট বই বার করে আমাকে দিয়ে বলল- তোমার ঠিকানাটা লিখে দাও তো এতে। ---দিলাম ঠিকানা লিখে।

সবাই মিলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। বিল মিটিয়ে দিল জ্যাক। বাইরের বারান্দায় আসতেই জিমি বলল--এখনও রাত কুমারী রয়েছে চল কোন পাবলিক বারে যাই। ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে। কফি খেয়ে এ তেষ্টা গেলো না।

আলেকস্‌ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল--না- না—প্লিজ্‌ জিমি চল আজ আমার বিশেষ দরকার আছে বাড়ী ফিরব।

আলেকস্-এর গলার উৎকণ্ঠাটুকু আমাদের কান এড়াল না। জ্যাক ওদের গুড্‌ নাইট জানিয়ে আমার কাছে এল। বলল—চল এখন তোমার সঙ্গে একটু হাঁটা যাক। ওঃ যা ঠাণ্ডা পড়েছে ক'দিন—কহতব্য নয়।

* * *

জ্যাক আর আমি সটান ইউনিয়ন ষ্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

রাস্তায় প্রচুর লোকজনের ভীড়। দোকানে দোকানে নানান রঙের আলো জ্বলছে। কিন্তু সেই জনারণ্যের মধ্যে আমি আর জ্যাক একেবারে ডুবে গিয়ে ভীড় কাটিয়ে চলতে লাগলাম। জ্যাকের মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে দিতে মোটেই অসুবিধা হল না সেই হাজার লোকের ভীড়ের মধ্যেও।

জ্যাক বলল—আশ্চর্য বলে মনে হয় আমার এই আধুনিক শিক্ষায় সভ্যতায় পুষ্ট মানুষকে। এরা সব চায় কিন্তু মন চায় না। মনের কথাকে আমল দিতে চায় না। কেবল বাইরেরটা নিয়েই মারামারি করে। এই জিমিকে দেখলাম আজ পুরোপুরি করে। ও আমার বন্ধু—কিছুদিন অক্সফোর্ডে দু'জনে একসঙ্গে পড়েছি। কবিতাও লেখে ছোকরা কিন্তু আবার্ডিনে এসে এই তিন বছরেও সে এতটা পালটে গেছে কে জানত? আমি তো বুঝি না মনের স্পর্শ না থাকলে সে কাব্য কেমন করে মহৎ হতে পারে? তোমার কাছে স্বীকার করছি শেলী আমার ভাল লাগে। ভাল লাগে সেক্সপীয়রকে, জন ডনকে, টেনিসন, ম্যাথ্যু আর্নল্ডকে। তাই টেগোরকেও আমার ভাল লাগে। এদের কাব্যে মনের স্পর্শ আছে। আন্তরিকতা আছে —সূক্ষ্ম আনন্দ-বেদনার উপলব্ধি আছে। আছে মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তাকে পরিপুষ্ট করবার রস।

আমার মধ্যে অনেকক্ষণ থেকে একটা কৌতূহল দানা বেঁধে উঠছিল। এবার সেটাকে প্রকাশ করলাম। বললাম—জ্যাক তোমাকে এখানে দেখেই আমার মনে পড়েছে সেই রাতের সেই মেয়েটিকে। শেষ পর্যন্ত তার কী হল বলতে পার? জ্যাক বলল—মেয়েটা বলো না, বলো ভদ্রমহিলা। ও বয়সে তোমার-আমার থেকেও কিছু বড়। তা হোক চেহারায় এখনো ছেলেমানুষটা আছে। সেজে থাকলে

এখনও প্রেটী বলতে বাধে না। ভদ্রমহিলা জীবনে গভীর শোক পেয়েছিল—স্বামী আর বয়স্ক ছেলে কয়েক দিনের আড়াআড়িতে মারা যাওয়াতে। বড্ড ইমোশ্যনাল মেয়ে তাই শোকটা ওকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। কোন কিছু ঠিক না করে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল আমেরিকাতে। পথে যে কাণ্ড ঘটল তাতো দেখেছো? এখন ও আমেরিকা যাবার ইচ্ছেটা ছেড়েছে। গ্লাসগো থেকেই ও আমার সঙ্গে আবার্ডিনে এসেছে। বললাম—সেকি? তুমি কী তাকে সঙ্গে নিয়ে এলে? জ্যাক নির্বিকারভাবে বলল—কী করি বল? মাস্তুল-ভাঙা জাহাজকে সমুদ্রের মাঝখানে কী করে ছেড়ে দিই বল? বললাম—কিন্তু ও তো তোমার পরিচিতও না—

জ্যাক বাধা দিয়ে বলল—তাতে কী? আজ যে অপরিচিত কাল সে পরিচিত এমন কী অতি পরিচিতও হতে পারে। এই যে তুমি—তোমার সঙ্গে আমার পরিচিত হতে সময় লাগল কী খুব বেশী? আসলে মনটা তুলে ধরতে হয়। সেটাকে লুকিয়ে ঢেকে মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে গেলেই সময় লাগে বেশী। কিন্তু মন দিলেই দেখবে বেশীর ভাগ জায়গায় মনটাই আগে বেরিয়ে আসবে। এ এমন জিনিস।

তারপর একটু দম নিয়ে আস্তে আস্তে বলল—দুনিয়া ভরে কত মানুষ জাহাজ তো এমনি বানচাল হয়ে যাচ্ছে। কটাকে উদ্ধার করতে পারছি বলনা? তবে যেটা একেবারে সামনে আসে তাকে চট করে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না। গ্লাসগোতে সেই ভদ্র মহিলাটির বন্ধু যখন তার বাসায় নিয়ে যেতে ইতস্ততঃ করল—তখনই আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম আমাকে কি করতে হবে। আর একবার ঠিক করে ফেললে কাজ করতে তা আমার কিছুমাত্র দেরী হয় না। জ্যাকের এ-স্বভাবের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম—সেই রাতে সেই বাসের মধ্যে।

অমন সব লজ্জা বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে যেতে যে পারে তাকে হাজার সেলাম না দিয়ে পারি না।

বললাম—কিন্তু সে রাতে তুমি কেমন করে বুঝলে—মেয়েটা আর্ত? তাকে সাহায্য দেওয়া দরকার।

জ্যাক মনে মনে বোধ হয় একটু বেশী রকম ভিজে উঠেছিল এই প্রসঙ্গতে। একটু অন্ধকার নিরিবিলির মধ্যেও আমরা এসে পড়েছিলাম। ইতিমধ্যে সে হঠাৎ আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে নরম গলায় আস্তে আস্তে বলতে লাগলো—আমার মন যে দুঃখের আগুনে পুড়েছে। একবার নয়—কয়েকবার। তাই ক্লিষ্ট মানুষের কান্না আমি চট করে বুঝতে পারি। আর তাছাড়া আমি কয়েকবছর সাইকো-প্যাথলজির ছাত্র ছিলাম। দেখেছি মানুষের এ্যাবনরম্যালিটি কী ভাবে বাড়ছে। চেতন মন দিয়ে মানুষ সমস্ত কিছুকে বাহ্যিক দিক থেকে আলিঙ্গন করতে চাইছে। তাই ভেতরের মনের দাবী সে সব সময়ে টের পেয়ে উঠছে না। এদিকে ভেতরের মনটা তার কাজ ঠিক করে চলেছে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে।

একটু চুপ করে জ্যাক কী ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণ পথ চলতে লাগল। তারপরে বলল—এই ধরনা যে কথা আগে বলছিলাম সেইটাই। মনের দিকে তো কেউ তাকায় না। মানুষ টাকা চায়, পয়সা চায়, রূপ চায়, ইউনিভার্সিটীর ডিগ্রী চায়—সম্মান প্রতিপত্তি ইত্যাদি অনেক কিছুই চায়। কিন্তু সবার ওপর যেটা চিরন্তন—যেটা গস্পেলের মতো সত্য—সেই মনকেই কেউ বুঝতে চায় না—জানতে চায় না। মন দিতেও তাই মানুষের কার্পণ্য—নিতেও। তাতে কত সাবধানতা কত কল-কৌশল বাৎলাবার প্রশ্ন। ফ্রয়েডের দল মনকে তুলে ধরবার চেষ্টা করলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সুপাচ্য করে সভ্য মানুষের পাতে তুলে দিলেন।

কিন্তু মানুষ তাকে আজ গ্রহণ করেছে নিতান্ত বিকৃত উপায়ে। নইলে ফ্রয়েড শুধুমাত্র আজ সেক্স-এর ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকতেন না। ফ্রয়েড যে ইড্, ইগো, আর সুপার ইগোর স্তরে মনকে ভাগ করলেন—তার গোড়ার কথাটাই ছিল মানুষ যাতে সুপার ইগোকে পরিপুষ্ট করে ইড্ অর্থাৎ পশুপ্রবৃত্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। কিন্তু কটা লোক সে কথার তাৎপর্য বোঝে? আর যারা বোঝে তাদের সাধনায় নিষ্ঠা কই? ইড্‌কে আমরা খাবার যোগাচ্ছি নিত্য। কিন্তু মানুষের মনতো। তার অপর সত্বাটা এদিকে যে খিদেয় মরে যাচ্ছে। ঐ মেয়েটীকেও দেখেছো তো কী ভাবে কাঁদল রাতে। ওরকম কেস আমি না হবে কয়েক ডজন দেখেছি। হয় তারা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদে, না হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আবোল তাবোল কথা বলে—কল্পিত ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চায়, না হয় বিচ্ছিরি হিষ্টিরিয়াতে ভোগে। ডাক্তাররা ওষুধ দেয়—শরীর সারাবার, কেউ কেউ হিপ্নোটাইজ করে। কিন্তু এসব রোগের আসল ওষুধটা কী জান বোধি? হল অকৃত্রিম স্নেহ আর ভালবাসা। এই স্নেহ আর ভালবাসা হল মায়ের বুকের দুধের মতো। মনকে গঠন করতে, পরিপুষ্ট করতে, রুগ্ন মনকে চাঙ্গা করতে—এমন জিনিস আর নেই। তবে দুঃখের কথা কী জান আজ এই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নরনারীর ভেতরে আসল ভালবাসায় ঘাটতি পড়ছে সব সময়ে। এ বড় দামী ওষুধ বোধি। যেখানে সেখানে আর এ পাওয়া যায় না।

একটানা কথা বলার পর জ্যাক থামল। তার মনের একটা গভীর অনুভূতিতে বোধ হয় আমি আঘাত দিয়েছিলাম—তাই সেখান থেকে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো তার আইডিয়াগুলো বার হয়ে এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল—আমি মনে মনে তার কথাগুলোই তোলা-পাড়া করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে দু'জনের চমক ভাঙল। দেখি ক্যাসলগেটে পৌছেছি। জ্যাক বলল—তত্ত্ব কথার ভেতরে তথ্যটুকু ডুবে গেছে। সেই ভদ্র মহিলার সম্বন্ধে—কথা শেষ হল না। থাক্ ও আর একদিন বলব এখন। আজ এই ঠাণ্ডায় আর বাইরে থেকো না। আচ্ছা গুড্-নাইট। বলেই সে আমার হাতটা ধরে একটা জোরে ঝাঁকানি দিল। তারপর সটান এ্যাবাউট টার্ণ করে কুইক্ মাচ করতে লাগল সামনের পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপে। আধা অন্ধকারে পিছনে দাঁড়িয়ে আমি তার সুদীর্ঘ চলন্ত মূর্তিটা দেখতে পেলাম। মনে হল ওর জীবনের চলার ভঙ্গীটাও অবিকল ঐ রকম—অচঞ্চল আর সুদৃঢ়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমিও বাসার দিকে চললাম।

[ক্রমশঃ]

—"নব্যভারত বলিতেছেন—পাশ্চাত্ত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্ত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য্য সম্পন্ন হইব। প্রাচীন ভারত বলিতেছেন—মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

রক্তরাগ

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

দেবেশ দাশ

১৩

মণিপুরী রাস। নাচ আর গানের আত্মহারা উৎসব।

কি হবে উপায়,

প্রিয় সজনী।

না। দেবল অসহায় অবস্থায় পড়ে উত্তমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করছিল না।

প্রশ্ন করছিল শ্রীরাধার সখী বৃন্দা, ললিতা এরা তাদের প্রিয় সজনীকে। মুখের ভঙ্গি, আঙুলের ইঙ্গিত, মিঠে সঙ্গীতে এই আকুল প্রশ্নটা প্রত্যেকের মনের উপর যেন ছড়িয়ে পড়ছিল।

মণিপুরী রাসের গোপন কথাই হচ্ছে এখানে। যারা নাচে, যারা গায় শুধু তারা নয়। যারা দেখে, যারা শোনে সবাই রাসের ভাবে বিভোর হয়ে যায়। এক পাশে শ্রীকৃষ্ণ অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য পাশে শ্রীরাধা বঙ্কিম ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন। যেন কিছুই হয় নি। বাইরে তার খুব শান্ত ভাব। শ্রীকৃষ্ণ চলে যাবেন, তা যান না কেন? আমার তাতে কি বা যায় আসে? মনে মনে কিন্তু তিনি অস্থির। ব্যাকুলা। মৃদু মৃদু চরণ নাচনে সেই অধীরতাই ধরা পড়ছে। মাঝখানে পাঁচ ছ'জন সখী। তারাই দেখাচ্ছে ব্যাকুলতা। তারাই এই মান অভিমানের অভিনয়ে বিহ্বল। তারাই গানের মধ্যে,

নাচের মধ্যে দু'জনের এই মানভঞ্জনের জন্য চেষ্টা করছে। পরস্পরকে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করছে—

কি হবে উপায়,
প্রিয় সজনী?

দেবল তন্ময় হয়ে কি দেখছে? কি শুনছে? বাংলা দেশে যা রাসলীলা হয়, তাতে মান-অভিমানের এত হেঁয়ালী, এত পরতে পরতে ঢাকা মনস্তত্ত্বের বালাই থাকে না। সেখানে যে মোটে দু'ঘণ্টায় সবটা নাচ দেখিয়ে শেষ করতে হবে। মণিপুরের মত সারা রাতের কারবার ত নয়। তাই কি দেবল সবটা মন ঢেলে মজে গিয়েছে এই নাচে?

কিন্তু সে ঠিক কোন্ জিনিষটা দেখছে? এই আবেগে উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল মুখের ভঙ্গি? না, হালকা ভাবে মিঠে সুবাস ছড়িয়ে যাওয়া চাঁপা ফুলের মত আঙ্গুলের মুদ্রা? না, নূপুরে জড়ানো সুন্দর চরণের চঞ্চলতা?

দেবল সবই দেখছে সহজ সোজা চাহনীতে। কিন্তু চারদিকে দলে দলে ভিড় করে বসে থাকা সিপাইদের উপরও যদি হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে চোখ গিয়ে পড়ে তা'হলে কি-ই বা করা যায়?

চট করে দেবলের হাঁটুতে একটা আঙ্গুলের টোকা পড়ল।

মণিপুরে মেয়েদের মধ্যে পর্দা নেই। তবু ছেলেরা আর মেয়েরা আলাদা দল করে বসেছে। অনেক ভিড় হয়েছে। এত ঠেসে বসতে হলে কোন একটা জায়গায় মেয়ে-পুরুষের আলাদা লাইন মিশে যাবেই। সেখানে বসেছিল উত্তমা আর দেবল।

কথায় বলে রাসমণ্ডলী। ঠাট্টায় বলে রসমণ্ডলী। রাধা-কৃষ্ণের

প্রেম একটা মণ্ডলী তৈরী করে তোলে। সবাই যেন এক-মন-প্রাণ হয়ে ভাব-রসে ডুবে যায়। এ ত শুধু নাচ নয়, গান নয়, এ যে পূজা।

আর তৈরী হয়েছে সিপাই মণ্ডলী। নানাশ্রেণীর সিপাই রাস-মণ্ডলী চারদিক থেকে ঘিরে বসে আছে।

অবশ্য কোন খারাপ মতলব ওদের নেই। গ্রামের লোকেরাও নির্ভয়ে বসে আছে। গ্রামের মেয়েরাও। সবাই মিলে একসঙ্গে থাকলে বিপদ কম। সিপাইরা বড় জোর হা করে তাকিয়ে থাকবে সবার সামনেই। তা ছাড়া ওদের ছাউনিও আছে কাছে-পিঠে। কাজেই সবাই মোটামুটি ভদ্রভাবে নিয়ম মেনে চলে। কারো জিনিষ-পত্রে হাত দিতে পারে না; ঘর-বাড়ীতে পারে না চড়াও হতে। যুদ্ধের বাজারে যুদ্ধ করছে না এমন লোকদের পক্ষে এটাই সবচেয়ে ভাল বন্দোবস্ত। তা ছাড়া এতে খেতে পাওয়ার, দু-পয়সা উপায় করবার পথটাও খোলা থাকে। বাইরে থেকেও আসে অনেক ফালতু ভিন্‌দেশী লোক। মিস্ত্রী, কনট্রাক্টর, রসদ যোগানদার ইত্যাদি। এ হেন জায়গায় দিনের পর দিন, মানে রাতের পর রাত, রাসনাচের মহড়া দিচ্ছে মণিপুরিরা। সিপাইরা টাকা খরচ করে দেখতে আসে। খুসীও থাকে গ্রামের লোকদের উপর। কাজেই রাস দেখতে আসা বেশ নিরাপদ। বিশেষ করে যখন সঙ্গে কোন মহিলা আছে। মেয়েদের সম্মান মণিপুরে খুব বেশী।

প্রথমে যখন ভঙ্গি নৃত্য দিয়ে নাচ সুরু হল—সবাই গান ধরল—"নাচত নাগর নাগরী সঙ্গে।" তখনই আসর বেশ জমে উঠল। দেবল আর উত্তমা এসে চুপ করে বসে পড়ল। কেউ নজর করল না।

উত্তমার বুদ্ধির তারিফ করতেই হবে। দেবল মনে মনে ভাবছিল যে কেমন চমৎকার ভাবে সব রকম সন্দেহ এড়িয়ে গা ঢাকা দিয়ে রাতটা

কাটাবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল এখন। প্রথমে সে এই রাসের উৎসবে আসতে চায়নি। কিন্তু উত্তমাই তাকে বুঝিয়ে ছিল যে এমন একটা উৎসবে না এসে ঘরে বসে থাকলেই লোক সন্দেহ করবে। এ সব জায়গায় কোন সন্দেহ না জাগিয়ে থাকা সহজ। কিন্তু একবার সন্দেহ সৃষ্টি হলে সেরকম ভয়ানক বিপদও হবে। পালাবার কোন পথই থাকবে না। একটু দূরে দূরেই রাস্তায় জঙ্গলে আঘাটায় মিলিটারী ঘাঁটি বসান আছে। বাইরে যেতে বা ভিতরে আসতে অনেক হাঙ্গাম। অনেক জেরা তদন্ত চলে। বৃটিশের সিংহের দল ঘাঁটি আগলাচ্ছে।

কিন্তু একথা বলেই উত্তমা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল---খবরদার যেন ওরকম ভারী আর ভয়ানক কথাগুলো মনেও ঠাঁই দিযো না। তা হলেই কখনো বেফাঁস কিছু করে বসবে। না হয় লোকে মনে করবে তোমার পরিচয়ে কোন গলদ আছে।

তা, চাঁদেও ত একটু গলদ থাকে—খুব একটা নিশ্চিন্ত ভাব দেখাবার জন্য উত্তর দিল দেবল।

—থাকুক, কিন্তু চাঁদকে নিয়ে কারবার করে শুধু কবি।

বাধা দিয়ে দেবল হেসে বললে---আর কে বলত?

উত্তমা বলল—তুমিই বলনা। তোমরা ত হচ্ছ কবি আর প্রেমিকের জাত। পাগলেরও বটে। তবে বিশেষ করে প্রেমিক।

মাথা নাড়ল দেবল,—উঁহু, মানলাম না। তুমি যখন কলকাতায় ছিলে কবি এন্তার দেখেছ মানলাম। কবিরা পাগল তা-ও না হয় ধরে নিলাম। কিন্তু প্রেমিক? কোথায় পেয়েছ বলত?

—কেন, হিংসা হচ্ছে নাকি? শুনেই?

—না, দেবী। শুধু যাদের উপর আমার হিংসা তারা প্রেমে পড়ে মরিয়া নয়। তারা লড়নেওয়ালা, দুসমণের সিপাই।

—চুপ, চুপ। গাছপালারও কান আছে।

—তারা নিশ্চয়ই প্রেমের আলাপ শুনবার জন্য আড়ি পাতে না। বোধ হয় তাদের মনোযোগ এড়াবার জন্যেই এই কদিন ধরে তোমার আলোচনাগুলো রোজই একটু কাব্য ঘেঁষা হয়ে যাচ্ছে।

উত্তমা সায় দিল,—তা ছাড়া আর কি কথাই বা হতে পারে? 'ওয়েদার ডিসকাস' কি চব্বিশ ঘণ্টা করা চলে?

দেবল হেসে ফেলল,—তাই বুঝি তুমি এমন একটা বিষয় বেছে নিয়েছ যাতে কোন বিপদ নেই। অথচ সেটা কলকাতায় থাকার সময় খুব ভাল করে মক্স করতে পেরেছিলে। ভাগ্যবতী তুমি। কলেজী জীবনটা তোমার কলকাতায় ভালই কেটেছিল দেখতে পাচ্ছি।

—তোমায় নিরাশ করতে হল, দেবল। মোটেই তা নয়। কো-এডুকেশনের কলেজে পড়েও কোন লাভ হল না। তোমাদের বাঙ্গালী ছেলেরা কবিতা পড়তে পারে। কিন্তু কবিতা করতে পারে না।

—কথাটা বড় হেঁয়ালী হয়ে উঠল।

—না। বড়ই পরিষ্কার। মাথা নেড়ে উত্তমা প্রতিবাদ করল—কলকাতায় এত লক্ষ বাঙ্গালী। কিন্তু ক'জনকে চোখে পড়ে যাদের সঙ্গে প্রেমে পড়তে ইচ্ছা হবে? অন্তত ডেকে নিয়ে কাব্য আলোচনা করতে?

এত ভাবনার মধ্যেও হেসে উঠল দেবল। বলল—তোমার জন্য সত্যি আমার দুঃখ হয় উত্তমা। কলেজে ছেলেদের সঙ্গে এক সঙ্গে পড়েও তেমন একজন তরুণ আবিষ্কার করতে পারলে না? তবে আমার দুঃখ অবশ্য তাদেরই জন্য। তোমার জন্য নয়।

—কেন? কেন?

—বাঃ, তারা তোমার মত এমন তরুণীরত্নের কাছে এল, অথচ তাকে আবিষ্কার করতে পারল না।

তার মানে, দেবল উত্তমার মধ্যে এমন কোন নারীর সন্ধান পেয়েছে যে সাধারণ নয়। যার সঙ্গ পাওয়া, মনোযোগ পাওয়া ভাগ্যের কথা বলে মনে করা চলে। উত্তমার মনে যেন জোয়ার এল। সে-ও ত সাধনার ধন, আপনার আবিষ্কারের যোগ্য রত্ন। কিন্তু কার কাছে সে আবিষ্কৃত হতে চায়?

কিন্তু সে কথা শুধু মনে মনেই থাকুক।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে দেবল আবার বলল, কি, তুমি আমার কথায় সায় দিতে পারছ না?

নীরবতা ভেঙ্গে উত্তমা বলল, দেখ তোমাদের মনে যতটা মধু, বুকেও ততটা পাটা থাকা উচিত ছিল।

সিপাইদের গোফের বহর দেখতে দেখতে দেবল ভাবছিল। আজ সকালেই উত্তমার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে নিয়েছিল যে এই গ্রাম থেকে আবার সামরিক খবর যোগাড় করার কাজ সুরু করতে হবে। এখানে এদের বেশ বড় ঘাঁটি। ঠিক লড়াইয়ের এলাকায় নয় বলে সিপাইরা একটু যেন নিশ্চিন্ত। অথচ প্রায় রোজই সৈন্যদলের যাতায়াত চলছে। গোয়েন্দাগিরি করে খবর বের করার খুব সুবিধা। ওদিকে কোহিমার পরে ইম্ফলে আজাদ-হিন্দ দল আরো কতদূর এগোল কে জানে?

চারদিক ঘিরে পুরো ধড়াচূড়ায় সাজা সিপাই বাহিনী। তারা সবাই তন্ময় হয়ে রাস-নাচ দেখছে। যে জীবনটা তারা লড়াইয়ে উৎসর্গ করেছে তা যেন সার্থক হচ্ছে এই নাচ দেখে। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা এর মধ্যে ফিস্‌ফাস্ করে কথাবার্তাও চালাচ্ছে। ঠিকাদারদের মধ্যে

জিনিষপত্রের দামের আমদানীর কথাও চলছে এই সঙ্গে। শুধু দেবলই চুপ।

তার হাঁটুতে একটা আঙ্গুলের মৃদু টোকা পড়ল।

চমকে উঠে দেবল উত্তমার দিকে তাকাল। যেন এতক্ষণ যে চুপ করে বসেছিল তা শুধু নৃত্যরস ভাল করে উপভোগ করবার জন্য।

উত্তমাই ফিস্‌ফিস্ করে বলল—লোকে অবাক হয়ে দেখছে যে একটী বাঙ্গাল হাইকোর্ট দেখছে।

দেবল জবাব দিল—কিন্তু তার বদলে ওরাই যদি বাঙ্গালকে দেখতে সুরু করে দেয়? তখন হাইকোর্টই কি আর ছেড়ে কথা কইবে?

মাথা নাড়ল উত্তমা—না, সে ভয় নেই। অনেককেই জানিয়ে দিয়েছি যে তোমার সঙ্গে কলকাতায় কলেজে পড়বার সময় চেনা ছিল। তুমি কন্‌ট্রাক্টের আশায় এখানে ঘোরাফেরা করছ, তাই দেখা হয়ে গেছে। সবাই নিজের হরেক চিন্তায় পাগল। তাই বেশী কেউ তলিয়ে দেখবে না। আর দেখ, দু'চারটে পদাবলী ঝেড়ে যাও কথাবার্ত্তায়।

—নিশ্চয়ই; আহা যদি এখন ওরা গাইত—

"অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।"

আশ্বাস দিয়ে উত্তমা বলল—হয়ত গাইবে; কিন্তু দেখো রাসের রসে ডুবে থেকো, কিন্তু ভেসে যেয়ো না।

—ডুবেই থাকব—জবাব দিল দেবল।

কিন্তু ভেসে উঠেছে এক শিখ সুবেদার-মেজরের ভুঁড়ি। মণ্ডপের ঠিক ওধারেই। বলতে গেলে দেবলের সামনা সামনি বসে আছে সে। তার মুখের উপর শোভা পাচ্ছে এক ইয়া বড় ঝাঁকালো চাপদাড়ি গোঁফ। মহাসুখে তাতে তা দিতে দিতে সে নাচের তারিফ করছে। অন্য হাতে হাঁটুতে তাল দিচ্ছে। তাল আবার কখনো কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হাঁটু

ছেড়ে ডাইনে বাঁয়ে গিয়ে পড়ছে। তার চোরা চাহনীও মাঝে মাঝে নাচের সখীদের সুন্দর মুখগুলি ছেড়ে অন্য কোন কোন জায়গায় গিয়ে পড়ছে।

গোটা দশেক ডে-লাইট বাতির আলোয় সমস্তটা মণ্ডপ একেবারে ঝলমল করছে। মণ্ডপের কাঠের থামগুলির উপর সুন্দর চিকণ করে নক্সা-কাটা শাদা কাগজের ফুলের কারুকার্য। আলোয় আলো সবটা জায়গা। তাতে শাদার শোভা এসে মিশেছে। নাচের আসরটা লতা-পাতা-কাটা কাঠের রেলিং দিয়ে গোল করে ঘেরা। তার বাইরে চারদিক ঘিরে বসে আছে সব লোক। একেবারে ভক্তিতে ভরাডুবি।

মণ্ডপের মাঝখানে সখীরা নাচছে। কাঠের বেড়ার ওপারে দুই প্রবীণা বসে গাইছে। পাশে 'রাসধারী' নেচে নেচে বাজাচ্ছে মৃদঙ্গ।

আচ্ছা, মৃদঙ্গ কেন?—ফিস্‌ফিস্‌ করে উত্তমাকে জিজ্ঞেস করল দেবল।

—বা রে, জান না মৃদঙ্গ ছাড়া হয় না রাস। ঠিক যেমন চন্দন ছাড়া হয় না কনের সাজ।

—কিন্তু তোমাদের দেশে দেখছি যে ছেলেরাও ফোঁটা চন্দন কাটতে কসুর করে না।

—আঃ হাঃ। আমাদের এখানে যে ছেলেরা মেয়েদের ডাকে সাড়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণের মত নিঠুর হয়ে বা অবুঝ সেজে বসে থাকে না।

—বড়ই আশার কথা, সন্দেহ নেই—বলল দেবল। বলতে বলতে ওই হাবিলদার মেজরের দিকে আবার একটা চোরা চাহনী পাঠাল।

উত্তমা তাড়াতাড়ি দেবলের আরেকটু কাছে সরে এল। বলল—আশা অবশ্য বিশেষ থাকে না। ওই নাচের আসরটুকুই সার। তারপর যে যার পথ দেখে সরে পড়ে।

—তাই ত ভাল। তুমি কি চাও যে কেউ পথেই বালুচরে আটকিয়ে থাকুক?

—আহা, বালুচর হবে কেন? পাকা সড়কের উপর দিয়ে চলছে যে।

—তার মানে সড়ক ছেড়ে সাজান গোছান ফটক দেখলে তার মধ্যে আশ্রয় নেওয়াই ভাল। কিন্তু ভবঘুরে যাবে কোথায়?

—কেন? ঘুরে যাবে, ফটকের মধ্যে।

—ফটকটা ত ফাটকের গেট হতে পারে।

উত্তমার কানে খট্ করে বাজল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই ঘণ্টার পর ঘণ্টা লম্বা নাচের আসরে মাঝে মাঝে দেবলের সঙ্গে এক-আধটা কথাবার্ত্তা কয়ে একঘেয়ে ভাবটাকে সে কমিয়ে রাখছিল। একঘেয়ে ত নিশ্চয়ই। কারণ সে না পারছে রাসের রসে মজে সিপাইদের ভুলতে; না পারছে সিপাইদের দেবলের মন থেকে সরিয়ে রাখতে।

দেবল আবার লক্ষ্য করল যে সুবেদার মেজরের তাল দেওয়াটা মাঝে মাঝে বেতালায চলছে। তার মানে কি? নেহাৎ নাচের মৌতাতে মশগুল? না, অন্য কোন মতলব আছে? না, কোন সংকেত?

চোরের মন বোঁচকার দিকে। দেবলের মনও সেই রকম এক দিকেই ঝুঁকছে। সুবেদার-মেজর ছাড়া অন্য কোন সিপাই বা অফিসারই তার দিকে লক্ষ্য করছে বলে মনে হয় না। নিজের মুখেও ত বেশ একটা লেপা-পোছা ভাব। তাই সেও সাহস করে সুবেদার-মেজরের দিকে একবার ভাল করে পুরো নজরে তাকাল। একটু হেসে উত্তমাকে বলল—দেখেছ, আমাদের সুবেদার-মেজর সাহেবের নাচটা বড়ই ভাল

লেগেছে। কেমন তারিফ করতে করতে তাল দিচ্ছে। আচ্ছা, হঠাৎ অতগুলি লোক উঠে গিয়ে কান্নাকাটি করে গড়িয়ে পড়ল কেন?

উত্তমা পরামর্শ দিল,—যাও, তুমিও চোখ মুছতে মুছতে ওই সূত্রধারীদের (বুড়ী গায়িকাদের) কাছে গিয়ে একটা পেন্নাম ঠুকে এস।

দেবল এ-হেন উপদেশের মানে খুঁজে পেল না। কে জানে তখনি হয়ত সবার নজর ওর দিকে এসে পড়বে। তাই অন্য কথা তুলল—এমন ফার্ষ্ট ক্লাশ নাচের সঙ্গে এত থার্ড ক্লাশ গান গাইছে। ব্যাপার কি? বুড়োরা ত মনে হচ্ছে নেহাৎ ন্যাকামি করেই কাঁদছে।

একটু রুক্ষভাবে উত্তমা বলল—যা বলছি কর গিয়ে। তোমার মনে এত ভক্তি আর বাইরে সেটা দেখাতেই যত লজ্জা। আর ফিরে এসে একটু দূরে সরে বসো।

তার শেষের কথাগুলি শেষ হবার আগেই দেবল মাথা নীচু করে গোল বেড়ার পাশ দিয়ে চোখ মছতে মছতে এগিয়ে গেল। অত্যন্ত ভক্তিভরা একটি সাষ্টাঙ্গ প্রণামে নিজেকে 'রাসধারী' বুড়ীদের সামনে একেবারে লুটিয়ে দিল।

ফিরবার পথে আবার সে ভাল করে চোখ মছতে সুরু করে দিল। শুধু কি চোখ? ভাবের ঘোরে সমস্তটা মুখই মোছার হাত থেকে রেহাই পেল না।

ফিরে এসে উত্তমার কাছাকাছি আবার বসা কি ঠিক হবে? যখন প্রথম এসে বসেছিল তখন অতটা কেউ নজর করে নি। ভাংগি নৃত্যে তখন সবাই ছিল মশগুল। এখন নেশা একটু ফিকে, নাচ একটু হাল্কা হয়ে এসেছে। অনেক মেয়েই উত্তমার মত আধুনিকা নয়। শাড়ীর বদলে 'ফান্বক' পরে ছেলেদের কাছ থেকে একটু আলাদা হয়েই বসেছে। ওই বুক থেকে পা পর্য্যন্ত ঢাকা রঙীন ডুরিকাটা কাপড়ে

মানাচ্ছে খুব সুন্দর, কিন্তু দেখেই মনে হয় যে ওই অজন্তা ষ্টাইলের সুন্দরীরা হালফ্যাসনের কাছে ঘেঁষে বসাকে পছন্দ করবে না।

এসে বসবা মাত্র একজন মণিপুরী ভদ্রলোক দেবলের সঙ্গে কথা জুড়ে দিলেন। বললেন—এই ভদ্রমহিলাটি আপনার পরিচয় দিচ্ছিলেন। আপনি বাংলা দেশ থেকে কিছুদিন হল এসেছেন, আর 'বাস' ফেল করে এখানে থেকে যেতে হল। বড় আফশোষের কথা। তবে ভাববেন না। আমাদের এই গ্রামে আপনার কোন অসুবিধাই হবে না। আমি বাংলা জানি; যখনি দরকার হবে আপনার সাহায্য করব।

দেবল তাড়াতাড়ি বলল—না, না কোন অসুবিধাই হচ্ছে না। এ দিকে সব জায়গাটাই ত বেশ ঠাণ্ডা আছে। লড়াইয়ের হাঙ্গামা নেই।

ভদ্রলোক বললেন—না, তা নেই বটে। কিন্তু বনে জঙ্গলে খুব জোর খানাতল্লাসী হচ্ছে। একটা জাপানী না তাদের দলের হিন্দুস্থানী কে একটা সিপাই এই তল্লাটে ঢুকে পড়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। তা এর মধ্যে হয়ত ধরাও পড়ে গেছে। জাপানী দুষমণ কি আর মণিপুরে লুকিয়ে থাকতে পারবে? চেহারাতেই মালুম দেবে। আসামী বা বাঙ্গালী হলে চেনা যেত না।

—ঠিক বলেছেন, একেবারে খাঁটি কথা। কিন্তু আশ্চর্য্য, মোটে একটা লোক, গায়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে কি করে?

—না, জন মনিষ্যির মধ্যে আসতেই পারবে না। ও নিশ্চয়ই জঙ্গলে টঙ্গলে শেয়ালের মত তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। তা তাতে আপনার আমার আর ভাবনা কি মশাই? আমি মণিপুরী, আপনিও গোবেচারা বাঙ্গালী। কলম-পেষা ছাড়া কি-ই বা আর করতে পারেন? শুনলাম, লোকটার ইউনিফর্মটার মাফ-জোক করে ওরা নাকি আন্দাজ করছে যে বাঙ্গালীর চেয়ে বেশী লম্বাই হবে।

দেবলের মন কিন্তু গানের দিকে। সে বলল—যাক গে মশায়, ও সব হ্যাঙ্গামোর কথা ভেবে আজকের রাতের নাচটা নষ্ট করে লাভ নেই। 'প্রিয় সজনী' কি মিষ্টি কথাটি মশায়। একেবারে মর্মে দোলা দিয়ে গেল। আর কী সুন্দর নাচ। আপনাদের দেশের গৌরব।

বলেই দেবল একটু সামলিয়ে নেবার চেষ্টা করল। আপনাদের দেশ—তার পরেই নিজের দেশ, তারপর ঠিক কবে সেখান থেকে এসেছি এ সব নানা কথা উঠে পড়তে পারে। তাই তাড়াতাড়ি যোগ করে দিল —উদয়শঙ্কর ত এই নাচ দেখেই অনেক নাচ তৈরী করেছেন।

ভদ্রলোক যেন ভাবে বিভোর হয়ে ছিলেন। বন্ধ করা চোখ একটু খুলে বললেন—আপনি উদয়শঙ্করকে দেখেছেন বুঝি? হ্যাঁ, তা ত দেখবেনই। কলকাতায় বাঙ্গালী আপনি। উদয়শঙ্কর, রবিঠাকুর, শরৎচন্দ্র এদের ত নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। মায় একেবারে বড় বড় বাঙ্গালী—চিত্তরঞ্জন, সুভাষ বোস এই রকম আর কি—এদেরও দেখে থাকবেন।

কিন্তু দেবল যেন এ সব কথা শুনতেও পায় নি। সে বলে চলল,—উদয়শঙ্করের নাচ—সে একেবারে ওয়াণ্ডারফুল। কিন্তু তার কারণ হচ্ছে যে তিনি আপনাদের নাচকেই একটু কেটে ছেঁটে বদলিয়ে দিয়েছেন। তবে এই দেখুন, আপনাদের চন্দ্রাবলী যে রকম লীলাভরে হাতের আঙ্গুলগুলি ঘুরিয়ে গেল এই মাত্র—এটা কি আর উদয়শঙ্করের দলের কোন মেয়ে পারবে? আর এই যে এত লোকের ভক্তি, এটাই ত নাচে আরো বেশী প্রাণ এনে দিচ্ছে। ষ্টেজের উপর কি আর এমনটি হতে পারে?

ভদ্রলোক ছাড়বার পাত্র নন। আবার জিজ্ঞেস করলেন,—তা মশায়, আপনি বোধ হয় বিদেশেও গিয়েছেন, অবশ্য হিন্দুস্থানের বাইরের কথা

বলছি। 'বল' ডান্সের কথা ছেড়ে দিন। ওদের 'ফোক' ডান্সেই বা কি আর এমন জিনিষ আছে? কিন্তু ধরুন বালিনিজ ডান্স, বর্মী মেয়েদের ডান্স। মালয়, শ্যাম, কত কি চমৎকার চমৎকার নাচ আছে ওদের। শুনেছি ওগুলি নাকি মণিপুরীর চেয়ে বেশী তফাৎ নয়; আবার রাধাকৃষ্ণ নিয়েই নাচ হয়। দেখেছেন সে সব?

না, দেবল কিছুই দেখেনি সে সব। কেবল এই নাচের আসরের ওপারে ঠায় বসা সুবেদার মেজরের ভুঁড়ি আর হাঁটুতে টক্কাটরে টরে-টক্কার মত তালের নাচ ছাড়া কিছুই সে দেখছে না।

তবু সে খুব সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল—আমি মশায় সাধারণ ঘরের লোক। ও সব বার্মিজ, বালিনিজ নাচ কোথায় দেখব। এক উদয়শঙ্করের নাচ দেখতেই কলকাতায় তিন দিন কিউ করে দাঁড়াতে হয়েছিল।

ভদ্রলোক খুবই ভদ্র আর দরদী। বললেন—তা ত হবেই, তা ত হবেই। সে জন্যেই মনে হয় আপনার এমন চমৎকার গায়ের রঙটা রোদে জ্বলে পুড়ে গেছে। তা না হলে কলকাতার গঙ্গা মাটির দৌলতে অরিজিন্যাল গায়ের রঙটা বেশী পুড়তে পায় না। এ সব পাহাড়ী জঙ্গলী দেশের রোদের কথাই আলাদা। তবে দেখুন, বাঙ্গালীর ফুলহাতা শার্ট পাঞ্জাবী পরলে অন্তত হাতের অনেকখানি বেঁচে যায়।

একটু থেমে ভদ্রলোক আবার বললেন—তার উপর দেখুন না; দুঃখের কথা কাকে বলে? আপনি টুপি পরতেন নিশ্চয়ই। তা কেন পরবেন না? চাকরীর জন্য লোকে পরে থাকে। কিন্তু আপনার টুপি পরার দাগ কপালে ছাপের মত লেগে আছে। আর এখন পরে বেড়াচ্ছেন মণিপুরী পোষাক। মাথায় নিশ্চয়ই রোদে বড় কষ্ট হয় আপনার। তা ছাড়া কাপড়ের কনট্রোলের দিনে তাঁতের মণিপুরী

কাপড় ছাড়া হঠাৎ এই বিদেশে মিলের কাপড় পাবেনই বা কোথায়? রাধে, রাধে, তোমার ইচ্ছাই সব।

শ্রীরাধার কথা ওঠাতে দেবব্রতর একটু সুবিধা হয়ে গেল। বলল—দেখুন, দেখুন আবার কত নতুন নতুন সঙ্গী এসে গেছে। কেমন চমৎকার নাচের 'পল্লেই' ঘাগরাখানা বাঁচিয়ে বেতের মোড়ার উপর বসছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ওদের নাচের পালা না আসবে ততক্ষণ গোল ফোলান ফ্রেমে আঁটা ঘাগরাখানা (পল্লেই) ত মড়ে নষ্ট হয়ে যেতে দেয়া চলে না। আর দেখুন 'রচোফাল'গুলিও কি সুন্দর। এমন সুন্দর শাদা জরির কাজ করা চাদর 'ফনেক'এর সঙ্গে কী চমৎকারই না ম্যাচ করে।

ভদ্রলোক সমঝদার ব্যক্তি। হেসে বললেন আপনার মণিপুরে আসা সার্থক হয়েছে মশায়। কি এত অল্প দিনেই এমন সব পোষাকের টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি নামগুলি পর্য্যন্ত শিখে নিয়েছেন। ব্যাপার কি বলুন ত?

তারপর গলার স্বর আরেকটু নীচু করে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কি? কোন তরুণী না কি? না, নতুন দেশের পথ ঘাট আচার ব্যবহার এসব সম্বন্ধে বই লিখবেন ফিরে গিয়ে? এ্যানথ্রপলজি, না জিয়োগ্রাফী?

দেবব্রত যেন প্রশ্নটা শুনতেই পায় নি। পাল্টা বলে বসল, দেখুন দেখুন, মশায়। ঐ সব ছোকরা ছোকরার দলও কেমন জুৎ করে বসে নাচ দেখছে। ওদেরও ইউনিফর্মগুলো ত ওই নৃত্যসখীদের পোষাকের মতই যত্নে রাখতে হবে। 'ক্রাশড' হয়ে গেলে ত চলবে না।

—আর মশায়, ইউনিফর্ম। শুনলেন ত, কোন অভাগা জাপানী না

আই-এন-এ তার টুটো ফুটো ইউনিফর্মটা জঙ্গলে ফেলেই পালিয়েছে। বাসাংশি জীর্ণানি যথা বিহায়— একেবারে গীতার বচন, মশাই।

দেবল অত সহজে ফাঁদে পা দেবে না। হেসে বলে উঠল,—না মশাই, আপনি একেবারে বেরসিক। গীতগোবিন্দ ছেড়ে গীতা? আর এই মণিপুরে? আপনার বুঝি—শূন্য মন্দির মোর?

—রাধে, রাধে। আপনার বুঝি শ্রীমন্দিরের দিকে নজর আছে? মানে, শ্রীঘর নয়। ওই যাকে বলে—অসারে খলু সংসারে সারং···। কি মশায়, শ্বশুর মন্দির না, শ্রীঘর? কোন্‌টা?

পাশে তাকিয়ে দেখল যে উত্তমা যেন এতক্ষণে একটু একটু করে কাছে এগিয়ে এসে বসেছে। নাচের দিকে তার বিশেষ মন নেই। তার পাৎলা ঠোঁট দুটি গুণ গুণ করে কি যেন গাইছে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে মাঝে মাঝে বোধ হয় বাংলা বের হচ্ছে।

নিশ্চয়ই কোন বিশেষ মানে আছে।

দেবল জিজ্ঞেস করল,—কি, বাংলা কথা মক্‌স করছ না কি?

হেসে উত্তর দিল উত্তমা,—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে কলকাতায় আছি, বাঙ্গালী বন্ধুর পাশে। তোমার পাশে গত বছর দুই যে রকম ভাবে কলকাতায় থেকেছি। তোমার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়িয়েছি আর গান শুনিয়েছি। মনে পড়ে, সেই যখন জাপানী বোমা পড়ল খিদিরপুর ডকে দিনের বেলা? সবাই পালাতে লাগল, আর আমি এ, আর, পি ট্রেঞ্চে অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে কি আর করি? তাই তোমাকে গান শোনালাম। তুমি এমন ভাবে শুনছিলে যে সাইরেনটা কখন 'অল ক্লিয়ার' জানিয়ে গেল তা-ও টের পেলে না।

দেবলও যেন পথ দেখতে গেল। সব কথাতে সায় দিয়ে গেল। আরো বলল,—শুধু তাই নয়। তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে কলকাতা

আমার এত ভাল লেগেছে যে আমি আর কোন দিন কলকাতা ছেড়ে দূরে থাকতে কিছুতেই পারব না। সে জন্যই ত দিল্লীতে একটা চাকরী পেলাম, তবু নিলাম না।

সেই ভদ্রলোক চুপ করে গেল। দুজন তরুণ তরুণী ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা কইছে। তার মধ্যে মাথা গলানর চেয়ে বেশী জরুরী কাজ তার আছে।

এদিকে নাচ খুব জমে উঠেছে। যত বেশী এগোয় রাত, ততই বেশী জমে ওঠে নাচ। ততই আসে ভিড়, আর আসে চোখের জল। ভক্তিতে দিশেহারা হয়ে বয়স্করা ত কেঁদেই ফেলল। উত্তমাও গুণ গুণ করে কত কিছু যে গেয়ে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। সবটা যে গান শুধু তাই নয়। কত গান, কত কথা।

ওদিকে বৃন্দা চন্দ্রাবলীরা গেয়ে চলেছে—

সাজল সাজল ধনি
মনোহর বেশে।

উত্তমার উপর একটা করুণ মমতায় দেবলের মন ভরে গেল। এই প্রথম মনে হল যে দেবল যদি ধরা পড়ে তাহলে উত্তমাও রেহাই পাবে না। অবশ্য তা যদি হয়, দেশের কিছু যায় আসে না। সারা বাংলা দেশ জুড়ে, সারা ভারতে এমন কত উত্তমাই ত নিজেকে বলি দিয়েছে।

কিন্তু তারা তা করেছে দেশকে ভালবাসে বলে। সব জেনে শুনে, ভেবে চিন্তে, দীক্ষা নিয়ে। উত্তমা কেন এমন ভাবে জড়িয়ে পড়ল? ওই ত নিজের মনের খুশীতে গান গেয়ে চলেছে—যেমন করে গাছের ডালে বসে পাপিয়া গায়—পিউ কাহা।

না, না। শিউরে উঠল দেবল। উত্তমার বিপদ হতে পারে এ

ভেবে দেবল শিউরে ওঠেনি। দেবল কেঁপেছে শুধু মৃদঙ্গের তাল আরো বেশী দ্রুত হয়ে উঠেছে বলে। তালে তালে রাঙানো চরণগুলির নূপুর আরো মদির হয়ে উঠেছে বলে। আরো অনেক সখী নাচের আসরে এসে ঢুকেছে বলে।

শ্রীকৃষ্ণের মান ভঞ্জন হল এতক্ষণে। তাই এবার তিনি মোহনচূড়া মোহনতর করে হেলিয়ে দিয়েছেন। মুখে বাঁশী নিয়ে রাধার কাছে এসে প্রেম-বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু শ্রীরাধা?

এবার তার পালা। পাছে তিনি আবার মান করে না বসেন যেন সেজন্যই আগে থেকেই বৈষ্ণব পদাবলী ছেড়ে জয়দেবের গানে চলে সখীরা। গান সুরু হল—

প্রিয়ে চারুশীলে,
মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।

দমকা বাংলা থেকে সংস্কৃতে বলে যাওয়াটার তারিফ করে উত্তমাকে কিছু বলা দরকার। উত্তমা ততক্ষণে ভাবের আবেগে দুলে দুলে একটু এগিয়ে গেছে। দেবলও এগোতে যাবে এমন সময় তার পিঠে কে একজন খুব শক্ত করে একটি হাত রাখল।

তার মানে খুব পরিষ্কার।

দেবল না এগিয়ে একটু একটু করে পেছিয়ে এল। পেছিয়ে এসে চুপচাপ দাঁড়াল। খুব নিচু স্বরে হিন্দুস্থানীতে বলল—হাতকড়া এখানেই লাগাবার দরকার নেই। বেরিয়ে আসছি, এমনিতেই। চল।

মোট কথা—উত্তমা যেন টের না পায়।

আসর ততক্ষণে আরো জমে গেছে। সবাই মেতে গেছে তাতে। কে আর খেয়াল রাখে পিছন থেকে কোথায় কারা উঠে চলে যাচ্ছে।

বর্ষীয়সী ভক্তিমতী রাসধারীরা গানে আখর দিতে দিতে ভাবাবেগে গলা প্রায় বুজে ফেলল। মুঞ্চ ম-য়ি-ই-ই করতে করতে এমন অবস্থা হল যে শুধু ইক ইক এরকম ধ্বনি হতে লাগল। গান মিলিয়ে গেল কণ্ঠে। সুর মিলিয়ে গেল রেশে। আর রেশ আওয়াজে।

আর দেবল? --চারজন সঙ্গীনধারীর আড়ালে।

(ক্রমশঃ)

"বাঙালী ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের জাতি সকল হইতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র। বাঙালার স্বাতন্ত্র্য, বাঙালার বিশিষ্টতার মূল উপাদান। বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বুঝিতে হইলে সর্ব প্রথম আমাদের—বাঙালীর উপাসক সম্প্রদায়ের পরিচয় লইতে হইবে; বঙ্গভাষার প্রসার পুষ্টি ও প্রকৃতির পরিচয় লইতে হইবে: জীমূতবাহন হইতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার পর্য্যন্ত প্রায় সাতশত বর্ষকাল কোন্ সিদ্ধান্তের উপরে বাঙালীর স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র বিস্তৃতি ও পুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহা জানিতে হইবে; বাঙালীর জাতিতত্ব ও কুলপরিচয় লওয়ারও আবশ্যক। আমাদের মনে রাখিতে হইবে বাঙালার স্বাতন্ত্র্য বাঙালীর বিশিষ্টতার মূল উপাদান।"

—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহিনী-কথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৮

বাক্যগঠন

পূর্ব পরিচ্ছেদে বলেছি কি শব্দে, কি বাক্যে, কি চিন্তায় পুনরুক্তি সর্বথা বর্জনীয়।

চিন্তায় পুনরুক্তি কিছু পরের প্রসঙ্গ ; আপাতত আমরা শব্দের এবং বাক্যের পুনরুক্তির কথাই আলোচনা করছি।

শব্দের পুনরুক্তি যত এড়িয়ে চলা যায় ততই ভাল। অবশ্য শব্দ বলতে যে-সকল শব্দ একেবারে সাধারণ নয়, সেই সকল শব্দের কথাই বলছি। কোন্ সকল কথা সাধারণ, আর কোন্ সকল কথা নয়, তার ধারণা লিখতে লিখতেই এসে যাবে। একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে কথাটা বোঝান যাক্।

লেখক লিখেছেন,—

> শরৎবাবু বলিলেন, 'তা বুঝি জান না রমাপদ? সামান্য একটু দূর্বা আর ফুলের পূজোয় সময়ে সময়ে দেবতা যেমন সাড়া দেন, সজোরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে হাঁক-ডাক করলেই তেমন দেন না—বিশেষতঃ এই সব ধ্রুব-প্রহ্লাদের মতো ছোট ছোট ছেলেদের বেলায়।' বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

উল্লিখি[illegible] রচনাংশতে আমার সংজ্ঞা (definition) অনুসারে 'শরৎবাবু', '[illegible]মাপদ', 'দূর্বা', 'কাঁসর-ঘণ্টা' ও 'ধ্রুব-প্রহ্লাদ' এই কয়েকটি

শব্দকে 'বিশেষ' শব্দ বলা যেতে পারে, যে শব্দগুলির কাছাকাছি ব্যবহারে পুনরুক্তি দোষ ঘটে। বাকি সকল শব্দ সাধারণ শব্দ, যার দ্বারা সহজে পুনরুক্তি দোষ ঘটতে পারে না।

এখন, লেখক যদি লিখতেন—

> শরৎবাবু বলিলেন, 'তা বুঝি জাননা রমাপদ? সামান্য একটু দূর্বা আর ফুলের পূজোয় সময়ে সময়ে দেবতা যেমন সাড়া দেন, সজোরে কাসর-ঘণ্টা বাজিয়ে ডাক-ডাক করলেই তেমন দেন না, বিশেষতঃ এই সব ধ্রুব-প্রহ্লাদের মতো ছোট ছোট ছেলেদের বেলায়।' বলিয়া শরৎবাবু হাসিতে লাগিলেন।

তাহ'লে এই অল্প একটু রচনার মধ্যে দুইবার 'শরৎবাবু' শব্দের ব্যবহারে পুনরুক্তি দোষ হোত, এবং কানে নিশ্চয় পীড়া দিত।

এমন কি, শেষের 'শরৎবাবু'র স্থলে 'শরৎবাবু' না লিখে লেখক যদি 'তিনি' ব্যবহার ক'রে লিখতেন,—'বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।' তাহ'লেও, পুনরুক্তি দোষ না ঘটলেও, অনাবশ্যক ভাবের দোষ ঘটত। তার চেয়ে শুধু 'বলিয়া হাসিতে লাগিলেন' লেখা কত সহজ, কত ঝরঝরে হয়েছে।

লেখাকে সরস, সাবলীল এবং সুখপাঠ্য করতে হ'লে এই সকল খুঁটি-নাটি কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না; সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রেখে সযত্নে এগুলিকে মেনে চলতে হয়।

কিছু পূর্বে বলেছি বিশেষ শব্দ বাদে বাকি সাধারণ শব্দের দ্বারা সহজে পুনরুক্তি দোষ ঘটতে পারে না। কিন্তু আলোচ্য রচনাংশেরই একস্থানে সাধারণ শব্দের দ্বারা পুনরুক্তি দোষ ঘটতে পারত, শুধু লেখকের সতর্ক শ্রুতিশক্তি তা ঘটতে দেয়নি। লেখক লিখেছেন, "সামান্য একটু

দূর্বা আর ফুলের পূজোয় সময়ে সময়ে দেবতা যেমন সাড়া দেন, সজোরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে হাঁক-ডাক করলেই তেমন দেন না।"

এখন, "তেমন দেন না" না লিখে তিনি যদি লিখতেন "তেমন সাড়া দেন না," তা'হলে ভাব প্রকাশের দিক থেকে পরিপূর্ণতা ঘটলেও, প্রথম 'সাড়া' শব্দটির কাছাকাছি থাকা হেতু অনাবশ্যক পুনরুক্তির ভারে রচনাংশটি ভারাক্রান্ত হ'ত।

দুটি অভিন্ন শব্দ কত কাছাকাছি থাকলে তারা পুনরুক্তির দ্বারা পীড়াদায়ক হবে, ইঞ্চি-ফুটের মাপে তার নিয়ম করা কঠিন। শিক্ষিত কান আপনিই তা নির্ণয় ক'রে নিতে পারবে।

> কানের মাঝারে ছন্দের বাসা, নিয়মে নহে ;
> কানে মানে না যে সুধীজন তারে বেকানা কহে।

পদ্যের ন্যায় গদ্যেরও যে ছন্দ আছে, এ কথা সতর্ক গদ্য লেখক মাত্রেই জানেন। শুধু অমিল শব্দের দ্বারা পদ্যের ছন্দঃপাত হয় ; আর, গদ্যের ছন্দঃপাত হয় সমিল শব্দের দ্বারা।

গদ্যেরও যে ছন্দ আছে, সে আলোচনা পরে করব ; আপাততঃ একটি দৃষ্টান্ত দিই যেখানে সমিল শব্দে গদ্যের ছন্দঃপতন না হ'য়ে আবেগ-আধিক্যের (Emphasis) সৌন্দর্যময় সৃষ্টি হয়েছে। দৃষ্টান্তটি এই—

> এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া রমাপদ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "এ ত গেল আমার দিকের কথা। তারপর কথাটা তোমার দিক থেকেও বিবেচনা ক'রে দেখ। আমি তোমার আত্মীয় <u>নই</u>, স্বজন <u>নই</u>, এই মাস চারেকের পরিচয় বাদ দিলে পরিচিতও <u>নই</u> ; আমি বিবাহিত কি অবিবাহিত, সাধু কি অসাধু, দুশ্চরিত্র কি চরিত্রবান, খল কি সরল কিছুই তুমি জান না। তুমি হিন্দুঘরের বিধবা, ঘটনার অপরিহার্য গতিতে

আমার সংসারে এসে পড়েছ, যেখানে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই, এমন কি দ্বিতীয় পুরুষও নেই ; সব দিক চিন্তা ক'রে সঙ্কোচের তোমার শেষ নেই ; তাই মাঝে মাঝে সমাজের রক্তনেত্রের কথা মনে পড়ে, আর পালাতে চাও শ্বশুর বাড়িতে কিম্বা মামার বাড়িতে, কিম্বা মাসীর বাড়িতে, যারা তোমাকে একদিনের জন্যে চায় না, যেখানে গেলে তোমার অবস্থা হবে আশ্রিতার আর জীবন হবে যন্ত্রণার। কিন্তু আমি বলি সরযূ, সমাজের কথা তুমিই বা কেন ভাব, আমিই বা কেন ভাবি ? যে মহাজন আমাদের কর্জ দেবে না, তাকে আমরা সুদ দিই কেন ? এস, আমরা সমাজের বাইরে আমাদের সংসার বাধি সমাজেরই মঙ্গলের জন্যে। বাইরে থাকলে সমাজকে তুমি ভালবাসতে পারবে, সমাজের তুমি কাজ করতে পারবে, ভিতরে গেলে শ্রদ্ধা হারাবে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তটিতে একই প্রকার শব্দের দুইটি বিভিন্ন জোট আছে। প্রথম জোটে তিনটি 'নই' ; আর প্রথম জোটের সামান্য একটু পরেই দ্বিতীয় জোটে তিনটি 'নেই'। তিনটি 'নই' এবং তিনটি 'নেই'-য়ে ত স্বতন্ত্র ভাবেই পুনরুক্তি দোষের আপত্তি তোলা যেতে পারত ; তা'ছাড়া মাত্র একটি একারের প্রভেদ ছাড়া 'নেই' এবং 'নই'য়ের ধ্বনি-সাদৃশ্য এত অধিক যে, উভয় জোটের ছয়টি শব্দকে একই গোত্রের খুড়তুত-জ্যেঠতুত ছয়টি সন্তানের ন্যায় মনে করলেও বিশেষ অন্যায় হোত না। কিন্তু উল্লিখিত দৃষ্টান্তে ঐ ছয়টি শব্দ যে অভিলষণীয় আবেগাধিক্য (Emphasis) সৃষ্টি করেছে, তারই পুণ্যে তাদের পুনরুক্তি জনিত ধ্বনি-সাদৃশ্যের অপরাধ কাটান্ গেছে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে আরও একটি লক্ষণীয় বস্তু আছে। দৃষ্টান্তটির

একেবারে শেষভাগে লেখক লিখেছেন, 'বাইরে থাকলে সমাজকে তুমি ভালবাসতে পারবে, সমাজের তুমি কাজ করতে পারবে, ভিতরে গেলে শ্রদ্ধা হারাবে।' লেখক এমনও লিখতে পারতেন, 'বাইরে থাকলে সমাজকে তুমি ভালবাসতে পারবে, সমাজের তুমি কাজ করতে পারবে, ভিতরে গেলে তুমি শ্রদ্ধা হারাবে।'

এরূপ লিখলে অভ্রান্ত বর্ণনের দিক দিয়ে অথবা ব্যাকরণের নিয়ম পালনের দিক দিয়ে অবশ্য কোন অন্যায় হোত না; কিন্তু তিনটি 'তুমি'র শেষের তুমিটি বাদ দিয়ে লেখক 'অনাবশ্যক বর্জনের' সুনীতি অনুসরণ ক'রে লেখার মধ্যে পরিচ্ছন্নতার যে শ্রী এনেছেন তা আসত না। অনাবশ্যকের ভার লেখার পক্ষে যে অতি দুঃসহ ভার সে কথা নবীন লেখকের সর্বদা মনে রাখা দরকার।

"দাদামশায়!"

চেয়ে দেখি দ্বার-প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিশাখা হাসছে।

"লিখছেন?"

"হ্যাঁ, ঘানি ঘোরাচ্ছি।"

হাসিমুখে বিশাখা বললে, "ভগবানের অনুগ্রহে এখনো বহুকাল ধ'রে আপনি যেন ঘানি ঘোরান।"

বললাম, "ভগবানের অনুগ্রহে এখনো বহুকাল ধ'রে আর কি-কি ঘোরাতে হবে ঘরে এসে ব'সে তার তালিকা দাও।"

ঘরে প্রবেশ ক'রে নিকটবর্তী চেয়ারে ব'সে বিশাখা বললে, "কিন্তু আপনার ক্ষতি করব না ত?"

বললাম, "করবে না, তা ত তুমি নিজেই জানো। তোমার কতকগুলি অযোগ্যতা আছে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কারো ক্ষতি করবার অযোগ্যতা। আর কি-কি অযোগ্যতা আছে শুনবে?"

দুই হাত জোড় ক'রে বিশাখা বললে, "দোহাই দাদামশায়, যা শুনিয়েছেন তাই যথেষ্ট, আর শুনিয়ে কাজ নেই। ··কি লিখছেন? —কাহিনী-কথা?"

"হ্যা।"

"পড়ব?"

"আগেরটা পড়েছ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় পড়েছি। বাক্য গঠন। এবার কি লিখছেন?"

"এবারও বাক্য গঠনই লিখছি।"

"এবারই শেষ হবে?"

"না, আরও এক কিস্তি লিখতে হবে।"

বিশাখা বললে, "বাক্য গঠনে আপনি খুব বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন।"

বললাম, "তা দিতে হবে বই কি? ভাল ক'রে ইট গড়তে না শেখালে ভাল ক'রে ইমারৎ গড়তে কেমন ক'রে শেখাব?"

"সে কথা সত্যি।" ব'লে বিশাখা বললে, "তা'হলে দিন, পড়ি।"

স্লিপগুলো গুছিয়ে পিন দিয়ে এঁটে বিশাখার হাতে দিলাম।

লেখাটা নিয়ে বিশাখা জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি এখন কি করবেন?"

বললাম, "মনে মনে না প'ড়ে যদি স-রবে পড়, তা'হলে শুনতে শুনতে লেখাটা রিভাইজ্ ক'রে নিই। নিজের চোখে না প'ড়ে অপরের মুখে শুন্‌লে বোধ হয় রিভাইজ্ করা আরও নির্ভুল হয়।"

হাসি মুখে বিশাখা বললে, "দাদামশায়, বার বার রিভাইজ করা বলছেন কেন? ওর বাঙলা প্রতিশব্দ আপনি ত অনায়াসেই দিতে পারেন।"

বললাম, "অনায়াসে দিতে পারলাম না ব'লেই ত রিভাইজের শরণাপন্ন হ'লাম। তুমিই বলনা রিভাইজের বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে।"

একমুহূর্ত নিবিষ্টভাবে চিন্তা ক'রে হাসি মুখে বিশাখা বললে, "ধরুন, পরখ ?"

বললাম, "পরখ বেশ সুন্দর প্রতিশব্দ হ'তে পারত, কিন্তু পরখের মধ্যে পুনর্দর্শনের ভাব ঠিক নেই যা রিভাইজের মধ্যে আছে। পুনর্পরখ হ'লে গুরুচণ্ডালী দোষ হবে, অবশ্য আজকালকার গণতান্ত্রিক দিনে গুরুচণ্ডালী ব'লে কোনো পদার্থ নেই। পুনর্পরীক্ষা কিম্বা পুনর্দর্শন মন্দ নয়। যা হোক, এ বিষয়ে রাজশেখরবাবুর কাছে একদিন দরবার করলেই হবে। আপাততঃ তুমি পড়তে আরম্ভ কর।"

নতমুখে সুস্পষ্ট সুরেলা কণ্ঠে বিশাখা পড়তে লাগল, পূর্ব পরিচ্ছেদে বলেছি, কি শব্দে, কি বাক্যে, কি চিন্তায় পুনরুক্তি সর্বথা বর্জনীয়।

[ক্রমশঃ

—"প্রতিমায় আবির্ভাব হতে গেলে তিনটি জিনিষের দরকার,—প্রথম পূজারির ভক্তি, দ্বিতীয় প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহস্বামীর ভক্তি।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

স্বদেশী আন্দোলনের সুবর্ণ-জয়ন্তী

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রভাব-প্রতিপত্তি তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার ধারণা ছিল যে, বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলে বাঙ্গালী জাতি দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং রাজনীতিক আন্দোলনে বাঙ্গালী আর নেতৃত্ব করিতে পারিবে না। সেই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াই তিনি পরিকল্পনা করিলেন বঙ্গ-বিভাগের। ইহা অবগত হইয়া বাংলার পক্ষ হইতে সর্বশ্রেণীর জন-নায়কগণ আপত্তি জানাইলেন। বিদেশী সরকারের তরফে অজুহাত দেখান হইল যে—বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর লইয়া গঠিত বিশাল প্রদেশটির শাসন-কার্য একজন ছোট লাট অর্থাৎ প্রাদেশিক শাসনকর্তার দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে; তৎকারণ ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগ (দার্জিলিং জিলা ব্যতীত) আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" নামে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা হইবে, নবগঠিত প্রদেশের শাসন-ভার ন্যস্ত হইবে একজন ছোট লাটের উপর। পূর্বোক্ত যুক্তি রাজনীতিক-ভাবে সচেতন বাঙালী জাতির বিচার-বিবেচনায় টিকিল না। বাঙালী দেখিতে পাইল যে,—কার্জনীয় পরিকল্পনায় বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বিভক্ত দুইটি প্রদেশেই বাঙ্গালী সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হইয়া পড়িবে। বাঙ্গালী জাতির সুযুক্তিপূর্ণ আপত্তি, আবেদন-নিবেদন এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারত-সচিব কর্তৃক বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ অনুমোদিত হইল এবং সেই সংবাদ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইল।

দূরদর্শী লোক-নায়ক স্বনামখ্যাত দেশসেবক স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহার সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক "সঞ্জীবনী" পত্রিকার ১৩ই জুলাই (১৯০৫ খ্রীঃ) তারিখের সংখ্যায় "কর্তব্য নির্দ্ধারণ" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির নিকট একটা সুবিবেচিত সম্ভাবনাপূর্ণ কার্যক্রম উপস্থিত করেন। কার্যক্রমটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙ্গালীর চিরাশৌচ হইবে। যতদিন বঙ্গদেশের ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় একত্র না হয়, ততদিন বাঙ্গালী শোকচিহ্ন ধারণ করিবে। বাঙ্গালী আমোদ প্রমোদ পায়ে ঠেলিয়া সমস্ত বঙ্গ এক করিবার মহাসাধনায় তপশ্চর্যা করিবে। জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙ্গালী বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে। করকচ খাইবে, তব বিদেশী লবণ খাইবে না। গুড় খাইবে, তব বিদেশী চিনি খাইবে না। জাতীয় অশৌচের সময় বাঙ্গালী আর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, জেলা বোর্ড বা লোকাল বোর্ডের সভ্য, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতে পারিবে না।

"জাতীয় অশৌচের সময় বড় লাট, ছোট লাট, কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে কোন কাজের জন্য আর অর্থদান করা হইবে না।"

"যতদিন জাতীয় শোকের অবসান না হয়, ততদিন রাজপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাবের আমোদে কেহ যোগ দিতে পারিবে না।

"লর্ড কার্জন বাঙ্গালীর সর্বনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি তিনি উদ্যত খড়্গ সম্বরণ না করেন, বাঙ্গালী আর রাজপুরুষদের সংস্রবে যাইতে পারিবে না।"

উল্লিখিত কার্যক্রম হইতে উৎপন্ন হইল "স্বদেশী আন্দোলন", ইহা "বয়কট আন্দোলন" বলিয়াও অভিহিত হইয়া আসিতেছে। অর্দ্ধ শতক

পূর্বের সেই আন্দোলন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে আনিল প্রাণ-বন্যা—যাহা মৃতপ্রায় জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। বঙ্গদেশের নেতৃবর্গ স্থির করিলেন যে,---বঙ্গ-বিভাগের ব্যবস্থাকে মানিয়া লইবেন না, যেহেতু তদ্দ্বারা বাঙ্গালী জাতির অখণ্ডতা নষ্ট হইয়া যাইবে এবং বাঙ্গালী সংহতি-শক্তি হারাইয়া দুর্বল হইয়া পড়িবে। সেই বৎসরের ৭ই আগষ্ট কলিকাতায় টাউন হলে বিরাট প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হয়। এত লোকসমাগম হইয়াছিল যে, একই সময়ে টাউন হলের দ্বিতলে, নিম্নতলে ও নিকটবর্তী ময়দানে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইল। কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতিত্ব করেন মূল সভায় এবং অপর সভা দুইটিতে সভাপতি ছিলেন ফরিদপুরের অম্বিকা মজুমদার ও কলিকাতার ভূপেন্দ্রনাথ বসু। পরোক্ত তিনটি সভায় যে চারিটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে তৃতীয় প্রস্তাবটি ছিল বিলাতী পণ্য বর্জন সম্পর্কে। ইংরাজী ভাষায় রচিত তৃতীয় প্রস্তাবটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল —

"ভারতীয় ব্যাপারে বৃটিশ জনসাধারণের ঔদাসীন্যের এবং বর্তমান সরকার কর্তৃক ভারতীয় জনমতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-স্বরূপ মফঃস্বলের বহু সভায় সরকারের বঙ্গবিভাগ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত বিলাতী দ্রব্য বর্জনের যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এই সভা তৎপ্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।"

ছাত্র ও যুবকগণ দলে-দলে শোভাযাত্রা করিয়া বিবিধ জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এবং "বন্দে মাতরম্", "জয় জন্মভূমির জয়" ইত্যাদি ধ্বনিতে মহানগরী মুখরিত করিয়া তুলিল। সহস্র সহস্র শোভাযাত্রী সভা-স্থলে আসিয়া সমবেত হইল। স্বদেশী আন্দোলনের কালেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমোঘ "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটি ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হইতে

থাকে এবং "বন্দে মাতরম্" জাতীয় জয়ধ্বনিরূপে বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে থাকে। অল্পকাল মধ্যে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত এবং "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি সমাদর লাভ করিতে লাগিল বাংলার বাহিরে অপরাপর প্রদেশে পর্যন্ত। স্বদেশী আন্দোলনের বেগবান প্রবাহ বর্ষার পার্বত্য নদীর স্রোতের মতো দ্রুতগতিতে সমগ্র বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়া দিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বরের সরকারী ঘোষণায় বিজ্ঞাপিত হইল যে, পরবর্তী মাসের ১৬ই তারিখ বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব কার্যকর হইবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভগিনী নিবেদিতা, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, তারকনাথ পালিত প্রভৃতি নেতৃবর্গ এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইয়া স্থির করিলেন যে,—১৬ই অক্টোবর জাতীয় শোক-দিবসরূপে পালন করা হইবে। সেই দিনের কর্মসূচীতে ছিল— সমস্ত দিবস কর্মবিরতি, অরন্ধন, জনসভায় বিলাতী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ এবং রাখীবন্ধন। ইহাও স্থির হইল যে,—ওই দিন কলিকাতায় ফেডারেশন হল বা অখণ্ড বঙ্গ-ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং জাতীয় ধন-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া অর্থসংগ্রহ করা হইবে। স্থিরীকৃত কার্যক্রম অনুসারে সমগ্র বঙ্গদেশে ১৬ই অক্টোবর জাতীয় শোক-দিবসরূপে পালন করা হইল। কলিকাতায় যান-বাহন চলাচল, হাট-বাজার, দোকানপাট, কাজ-কারবার ইত্যাদি সমস্তই বন্ধ ছিল। সহর ও সহরতলীতে কলকারখানা-গুলির কাজ চলে নাই কুলি-মজুরেরা অনুপস্থিত ছিল বলিয়া। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় "ফেডারেশন হল"এর ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল,— আপার সার্কুলার রোডে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও মূক-বধির বিদ্যালয়ের মধ্যস্থিত ময়দানে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র নরনারীর এক বিরাট সমাবেশে।

কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু সেই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তিনি তখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। তাঁহাকে একখানি আরাম-কেদারায় শোয়াইয়া সভাস্থলে বহিয়া আনা হইল। সভাপতির লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুঃখের বিষয় যে,—অখণ্ড বঙ্গ-ভবনের নির্মাণকার্য পরিকল্পনা অনুসারে যথা সময়ে সম্পন্ন হইতে পারে নাই। নানা কারণে বহু বৎসর পর্যন্ত সেই কার্যটি হাতে নিতে পারেন নাই ফেডারেশন হল সোসাইটির পরিচালকবর্গ। স্বদেশী আন্দোলনের সুবর্ণ-জয়ন্তীর বৎসর (১৯৫৫ খ্রীঃ) ফেডারেশন হল-এর (২৯৮-২-১আপার সার্কুলার রোডে) নির্মাণ-কায শেষ করাইয়া দ্বারোদ্ঘাটন করা হইয়াছে।

ভিত্তি-স্থাপন অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পরে বিশাল জনতা বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ীর দিকে যায়। সেই বাড়ীর সম্মুখস্থ ময়দানে "জাতীয় ধন-ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে লক্ষাধিক নরনারী সমবেত হইয়াছিল। মহানগরীর আকাশ-বাতাস মুহুমুহু প্রতিধ্বনিত হইতেছিল সম্মিলিত কণ্ঠের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে। বিকাল প্রায় পাঁচটা হইতে রাত্রি প্রায় এগারটা পর্যন্ত ধন-ভাণ্ডারের জন্য অর্থ-সংগ্রহের কার্য চলিল। সেই সময়ের মধ্যে সংগৃহীত হইল পঁচিশ হাজার টাকা। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইবে বলিয়া নেতৃবর্গ বুঝিতে পারেন নাই। অর্থ-সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় সহস্র সহস্র দানেচ্ছু ব্যক্তিকে নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। পূর্বোক্ত পঁচিশ হাজার টাকার প্রায় সমস্তই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দান। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভেই বাংলার জনগণ-চিত্তে স্বদেশ-প্রেমের কি উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল! স্বদেশী আন্দালনের আদি পর্বের কাহিনী এইখানেই সংক্ষেপে শেষ করিলাম।

এখন মধ্য পর্ব ও অন্ত্য পর্বের কাহিনী শুনাইব সংক্ষেপে। আন্দোলনের দ্রুত ও ব্যাপক প্রগতি বিদেশী শাসকমণ্ডলীকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। ইহাকে অঙ্কুরোদ্গমে নষ্ট করিবার দুরভিসন্ধিতে তাঁহারা নিগ্রহ-নীতি অবলম্বন করিলেন। ছাত্রগণের উপর তাঁহাদের শ্যেন-দৃষ্টি পড়িল প্রথমে, কেননা ছাত্র-সমাজ ছিল আন্দোলনের পুরোভাগে। নেতৃবর্গের আদেশে ছাত্রেরা দলবদ্ধ হইয়া কলিকাতায় এবং কলিকাতার বাহিরে সহরে ও মফঃস্বলে বিলাতী দ্রব্যের দোকানে "পিকেটিং" করিত। নেতারা এইরূপ নির্দেশও দিয়াছিলেন —যেন কাহারও উপর বলপ্রয়োগ করা না হয়, বিনীত ভাবে অনুরোধ করিয়া ও বুঝাইয়া-শুনাইয়া ক্রেতাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পশ্চিম বঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে প্রত্যেক জেলায় বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের উপর এই মর্মে সরকারী সার্কুলার জারী করা হইল,— ছাত্রগণ যেন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান না করে। ইহার প্রতিবাদে কলিকাতার ছাত্র-সম্প্রদায় স্থাপন করিল "অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি" নামে একটি ছাত্র-প্রতিষ্ঠান। শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (পরে ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অ্যাড্ভোকেট), শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, রামকান্ত রায় মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, মণী বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে ব্যারিষ্টার), শ্রীসুকুমার মিত্র প্রভৃতি ছিলেন সোসাইটির বিশিষ্ট কর্মী। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, যোগেশ চৌধুরী (ব্যারিষ্টার) প্রভৃতি নেতৃবর্গের উপদেশে এই ছাত্র-প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হইত। ইহার বহুমুখী কার্যাবলীর মধ্যে একটি কার্যের উল্লেখ করিতেছি। সোসাইটির কার্যালয়ে স্বদেশ-জাত বস্ত্র বিনা লাভে বিক্রয় করা হইত, এবং কর্মিগণ দেশী কাপড়ের মোট পিঠে লইয়া কলিকাতার রাস্তায় ও গলিতে ঘুরিয়াও বিক্রয় করিতেন। তখন ভ্রাম্যমাণ তরুণ দেশ-সেবক-

গণের মিলিত কণ্ঠে গীত হইত কান্ত-কবির সেই লোকপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীতটি :—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই ;
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সূতার সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই ;
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ওই দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই ;
তবু তাই বেচে কাচ সাবান মোজা কিনে করি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই !
পরের জিনিস কিনব না, যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই।"

সোসাইটির সম্পাদক শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ছিলেন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তিনি বি. এ. পড়া ছাড়িয়া দিয়া স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার বাগ্‌বিভূতি তাঁহাকে খ্যাতি ও মর্যাদা দিয়াছিল। শচীন্দ্রপ্রসাদের বাগ্মিতা অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিত ! নবগঠিত ছাত্র-প্রতিষ্ঠান "অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি" ব্যতীত কলিকাতার অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি ইত্যাদি আগেকার ব্যায়াম-সংস্থাগুলিও আন্দোলনে যোগদান করিল।

পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গেই স্কুল-কলেজের ছাত্রগণকে দমন করিবার জন্য রাজপুরুষগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কোন কোন স্থলে শিক্ষায়তন-গুলিকে সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা হইল এবং শিক্ষককে পদচ্যুত করা হইল। রংপুরে জিলা স্কুলের ছাত্রগণ সহরে অনুষ্ঠিত এক স্বদেশী সভায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া তদানীন্তন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইমার্সনের আদেশে প্রধান শিক্ষক তাহাদের জরিমানা করিলেন। সেই অন্যায় আদেশ মানিতে অস্বীকার করিয়া তাহারা বিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া

আসিল। স্থানীয় নেতৃবর্গ কালবিলম্ব না করিয়া স্থাপন করিলেন জাতীয় বিদ্যালয়। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ য়্যাড্‌ভোকেট ও যশস্বী সাহিত্যিক শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এম. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পরে সেই বিদ্যালয়ে বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করেন। তাঁহার পিতা রংপুরের খ্যাতনামা উকিল উমেশচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা। শিক্ষাব্রতী ব্রজসুন্দর রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্যভার গ্রহণ করিলেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন পণ্ডীচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সুরেশ চক্রবর্তী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রফুল্ল চক্রবর্তী। উভয়েই ছিলেন যুগান্তর বিপ্লবী দলের নির্যাতিত বিশিষ্ট সদস্য ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্র। প্রফুল্ল দেওঘরের এক পাহাড়ে বোমা পরীক্ষা কালে নিহত হন। এই জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্র শহীদ প্রফুল্ল চাকী। ডিসেম্বর মাসে (১৯০৫ খ্রীঃ) নোয়াখালী জিলা স্কুলের নয় জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়। পূর্ববঙ্গের আরও কয়েকটি জেলায় ছাত্রদের উপরও নিগ্রহ-নীতি প্রয়োগ করা হইল। কিন্তু বাংলার সদ্যোজাগ্রত ছাত্রগণ ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইল না। তাহারা শৃঙ্খলাপরায়ণ সাহসী সৈনিকের মতো অগ্রসর হইতে লাগিল লক্ষ্য-স্থলে পৌঁছিবার জন্য।

ব্যাপক ছাত্র-দলন নেতৃবর্গকে ভাবাইয়া তুলিল। তাঁহারা জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। কলিকাতায় নেতৃবর্গের এক সভায় স্থির হইল যে, অবিলম্বে জাতীয় শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া নিগৃহীত ছাত্রদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমে সুবোধ মল্লিক দান করেন এক লক্ষ টাকা, পরে শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী দান করেন পাঁচ লক্ষ টাকা। আরও অনেক দেশভক্ত তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অর্থ দান করিলেন। জাতীয় শিক্ষা

দানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইল জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ বা ন্যাশান্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন। যাদবপুর টেকনোলজিক্যাল কলেজ নামক ভারত-বিশ্রুত শিক্ষায়তনটি পূর্বোক্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদেরই বিরাট অবদান।

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের (বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্সের) অধিবেশন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বনামখ্যাত জননায়ক কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তৎপূর্বে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ছোটলাট ফুলার সাহেবের পরিচালিত গবর্ণমেণ্ট এক সার্কুলার জারী করিয়া বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন উপলক্ষ্যে সেই অন্যায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হয়। পূর্বোল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা "বন্দে মাতরম্ সার্কুলার" নামে কুখ্যাতি লাভ করে। কন্‌ফারেন্সের প্রথম দিন (১৯০৬ খ্রীঃ ১৪ই এপ্রিল) সহস্র সহস্র বাঙালীর এক বিরাট শোভাযাত্রা "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে এবং "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের রচিত "মাগো যায় যেন জীবন চ'লে, শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে "বন্দে মাতরম্" ব'লে"—সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে রাজপথ দিয়া প্যাণ্ডেলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের উপর পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্পের অধিনায়কত্বে সশস্ত্র পুলিশ হিংস্র জানোয়ারের মতো আক্রমণ চালায়। লাঠির আঘাতে যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ অনেকেই আহত হইলেন। কাহারও মাথা ফাটিয়া রক্তপাত হইল, কাহারও হাড় ভাঙ্গিল এবং কেহ চেতনা হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ওইরূপ নির্দয়ভাবে প্রহৃত হইয়াও কেহই সংকল্পচ্যুত হইলেন না। উল্লিখিত জাতীয় সঙ্গীত দুইটি অবিরাম গীত হইতে লাগিল এবং সহস্র সহস্র কণ্ঠে অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হইতে

লাগিল মাতৃ-বন্দনা "বন্দে মাতরম্"। পুলিশ-বাহিনী অপেক্ষা সংখ্যায় শোভাযাত্রীরা বহুগুণ বেশী হইলেও নেতৃবর্গের আদেশ মান্য করিয়া তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াও প্রহার করেন নাই, আজ্ঞাবহ শৃঙ্খলাপরায়ণ বীর সৈনিকের ন্যায় আঘাতের পর আঘাত মাথা পাতিয়া নিলেন। এইভাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) অস্ত্রের সার্থক প্রয়োগ হইয়াছিল বাংলাদেশে বরিশালের রণাঙ্গণেই প্রথম। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য পথে বাংলা দেশে অনুসৃত এই নীতি গান্ধী-যুগে "সত্যাগ্রহ" নামে প্রচারিত ও প্রযুক্ত হয়। সেই স্মরণীয় দিবসের ঐতিহাসিক শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখ জন-নায়কগণ। সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হইলে অপরাপর নেতারা পুলিশ সাহেবের সম্মুখে যাইয়া তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিতে বলিলেন। কিন্তু আর কাহাকেও গ্রেপ্তার করার হুকুম নাই বলিয়া মিঃ কেম্প অক্ষমতা জানাইলেন।

সুরেন্দ্রনাথ সকলকে ওইভাবেই মিছিল লইয়া সম্মিলন-মণ্ডপে যাইয়া কাজ আরম্ভ করিতে নির্দেশ দেন। বিশাল জনতা সম্মিলিত কণ্ঠের গগন-বিদারী "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির সঙ্গে নেতার নির্দেশ মানিয়া লওয়ার সম্মতি জ্ঞাপন করিল। মিঃ কেম্প সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া গেলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইমার্সনের কুঠিতে। ইমার্সন সাহেবের রঙ্গালয়ে অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই বিচার-প্রহসনের অভিনয় সমাপ্ত হইল। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে তিনি দুই শত টাকা জরিমানা দিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। এই অর্থদণ্ডাদেশের পূর্বেই আদালত অবমাননার অভিযোগে তাঁহার দুই শত টাকা জরিমানা হইয়াছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দাম্ভিকতা

তখনই চরমে উঠিয়াছিল, যখন তিনি নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের প্রসঙ্গ তুলিয়া মন্তব্য করেন—"Was this all not a disgrace !" অর্থাৎ তোমরা নির্লজ্জের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ ! আসামী হইলেও তেজস্বী জননায়ক সেই অন্যায় মন্তব্য সহ্য করিতে পারিলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন—"আমি ওইরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ করি। ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখে ওইরূপ মন্তব্য শোভা পায় না।" ইহা হইতেই আদালত-অবমাননার অভিযোগের উদ্ভব হয়। কলিকাতা হাইকোর্ট পরে অর্থদণ্ডের দুইটি আদেশই বাতিল করিয়া দেন। প্রাদেশিক সম্মিলনের দ্বিতীয় দিবসের (১৫ই এপ্রিল) অধিবেশন চলিতে থাকা কালে ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রদত্ত ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা অনুসারে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে,—কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনের পূর্ব হইতেই বাখরগঞ্জ জেলায় ফুলারী রাজত্বের স্বৈরশাসন ও চণ্ডনীতির দাপট চলিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রগতি ব্যাহত হয় নাই।

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য পর্বের অপর দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ত্রিপুরা জেলা ও ময়মনসিংহ জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোট লাট স্যার ব্যাম্‌ফাইল্‌ড্‌ ফুলার ভেদ-নীতি অবলম্বন করার ফলেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়াছিল। রাজকর্মচারীরা দাঙ্গায় কেবল উস্কানী দেন নাই, প্রকাশ্যে আক্রমণকারী মুসলমান দাঙ্গা-বাজদের সমর্থনও করিয়াছেন। ভেদনীতির ফাঁদে পড়িল উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই ; তবে ফাঁদে-পড়া শিকারের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী, হিন্দুর সংখ্যা সেই তুলনায় অনেক কম। ইহার প্রধান কারণ এই যে,—রাজনীতি-ক্ষেত্রে তৎকালে মুসলমান সম্প্রদায় ছিল অনগ্রসর, পক্ষান্তরে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ লইয়া হিন্দু সম্প্রদায় অনেক দূর

অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। ফুলারী সরকারের অনুসৃত ভেদনীতির ফলে দুর্ভোগ ভুগিতে হইল উভয় সম্প্রদায়কেই। আন্দোলনের অগ্রগতিতে ব্যাঘাত কিছুটা সৃষ্টি করিল বটে, কিন্তু উহাকে বিনাশ করিতে পারিল না।

মধ্য পর্বের অনুসৃত চণ্ডনীতির নিরঙ্কুশ প্রয়োগের ফলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দ্রুতগতিতে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বৃটিশ শাসনে আস্থা হারাইলেন। লোক-লোচনের অন্তরালে গোপনে বাংলার বিপ্লবপন্থী নেতারা তাঁহাদের পূর্ব-পরিকল্পিত সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজনকে সফলতার পথে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার বৎসর তিনেক পূর্বে বিপ্লবী নেতা অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ) তৎকালীন কর্মস্থল বরোদা হইতে তাঁহার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলাদেশে পাঠাইয়াছিলেন গুপ্ত সমিতি গঠন ও প্রসারের জন্য। তখন সে কর্ম-প্রচেষ্টায় আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। পরন্তু স্বদেশী যুগে বৈদেশিক শাসকমণ্ডলীর রুদ্রনীতি বিপ্লববাদের ক্ষেত্রকে উর্বর করিয়া দিল। কিশোর ও যুবকেরা দলে দলে গুপ্ত সমিতিগুলির পরিচালিত ব্যায়ামশালায় ও পাঠাগারে যোগ দিতে লাগিল। যুগান্তর, অনুশীলন সমিতি,আত্মোন্নতি সমিতি, বরিশাল পার্টি, সুহৃদ সমিতি ইত্যাদি বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইল। নিগ্রহ-নির্যাতনের অভিশাপের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী পাইল দেবাশীর্বাদ। মুক্তি-সাধনার তরুণ সাধকেরা শুনিতে পাইল দৈব-বাণী—"মা ভৈঃ মা ভৈঃ।" বন্দিনী দেশমাতৃকার অশ্রুসজল আনন—বেদনাতুর মূর্তি তাহাদের ত্যাগপূত মানসে প্রতিফলিত হইল। সাধক-গণের কানে আসিয়া পশিল উর্ধ্বলোকে কোন্ অজানা দেশভক্ত চারণ-

কবির কণ্ঠে গীত অশ্রুতপূর্ব অভিনব জাতীয় সঙ্গীতের দুইটি মর্মস্পর্শী করুণ কলি—

"কংস-কারাগারে দেবকীর মত,
বক্ষেতে পাষাণ লৌহ-শৃঙ্খলিত,
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত
পরিচয় তুমি তাহারি সন্তান।
প্রকৃত সন্তান জেনো সেই জন
নিজ দেহ-প্রাণ দিয়ে বিসর্জন,
যে করিবে মা'র দুঃখ বিমোচন
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।"

মায়ের বন্ধন-মোচনের ব্রত গ্রহণ করেন সাধককুল নিভৃতে একান্তে। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য ও অন্ত্য পর্বে সেই ব্রত পালন-কল্পে আত্ম-বলিদান করিলেন—প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, কানাই-লাল দত্ত, সত্যেন বসু। ওই পঞ্চ-রত্নের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উত্তর কালে আরও কত ঋত্বিক শৃঙ্খলিতা জন্মভূমি-জননীর মুক্তি-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিলেন। স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় বিপ্লবের অগ্নি-যুগের প্রবর্তক। স্বদেশী আন্দোলনের স্রোত মধ্য পথে আসিয়া দিগন্ত-বিস্তৃত বালুচরে নিরুদ্দেশ হইয়া যায় নাই। উহার গোমুখী হইতে দুর্নিবার বেগে নামিয়া আসিল বিপ্লবের ভাগীরথী বঙ্গভূমি-তলে। বাংলার নব-জাগৃতির আন্দোলন যুগল-ধারায় প্রবাহিত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল মহাসিন্ধুর পানে।

নিগ্রহ-নীতির প্রয়োগে সৃষ্টি হইল বহু রাজনীতিক মামলা-মোকদ্দমা। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ও জাতীয় সাহিত্যের প্রতি উভয় বঙ্গের শাসক-বর্গের কোপদৃষ্টি পড়িল। কলিকাতায় ইংরেজী দৈনিক বন্দে মাতরম্,

বাংলা সাপ্তাহিক যুগান্তর, বাংলা দৈনিক সন্ধ্যা ও নবশক্তির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনীত হইল। মফঃস্বলে সাপ্তাহিক বরিশাল হিতৈষী ও জাগরণ পত্রিকাকে জড়িত করা হয় রাজদ্রোহের মামলায়। প্রায় সমস্ত মামলায় আসামীরা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। বন্দে মাতরম্-এর সম্পাদক বলিয়া অভিযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পাইলেন প্রমাণের অভাবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনবদ্য "নমস্কার" কবিতার মধ্য দিয়া দেশ-নায়ককে অভিনন্দিত করিলেন—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী মূর্তি তুমি।"......

বন্দে মাতরম্ পত্রিকার রাজদ্রোহের মামলায় জননায়ক বিপিনচন্দ্র পাল সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য সমন পাইয়া কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির হন। কিন্তু তিনি অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন না স্থির করিয়া হলফ্ লইলেন না। আদালত অবমাননার অভিযোগে তাঁহার প্রতি ছয় মাস বিনা-শ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

বাংলায় বিদেশী রাজের দমন-নীতির ব্যাপক ও অবাধ প্রয়োগের প্রসঙ্গে অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ) তৎকালে বাংলার বাহিরে এক জনসভায় বাঙ্গালী যুবকদের লাঞ্ছনা-ভোগ ও দুঃখ-বরণের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত ভাষণের কতকাংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিতেছি—

স্বাজাতিকতার সদ্যপ্রাপ্ত নব-তত্ত্বের প্রেরণায় বাংলার যুবকগণ উন্মাদনার মুখে ছুটিয়া আসে। তাহারা নবলব্ধ শক্তির আনন্দে আত্ম-হারা হইয়া দ্রুতবেগে আগাইয়া চলে এবং চলার পথে যাবতীয় বাধা-

বিঘ্নের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। ইহাদিগকেই আজ আহ্বান করা হইয়াছে দুঃখ-যাতনা ভোগ করিবার জন্য। তাহারা আহূত হইয়াছে বিজয়ের মাল্য পরিবার জন্য নহে, দুঃখ-ভোগ কিংবা মৃত্যু-বরণের মধ্য দিয়া শহীদের মাল্য পরিবার জন্যই। "They were called upon to bear the crown, not of victory but of martyrdom."

নবধর্মে দীক্ষিত বাংলার অক্ষয় প্রাণ-শক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া স্বাজাতিকতা-বেদের উদ্গাতা অরবিন্দ বলেন—বাংলা দেশে কিসের বলে আমরা টিকিয়া আছি? স্বাজাতিকতার বিনাশ হয় নাই—হইবেও না। ঐশী শক্তিতেই স্বাজাতিকতা টিকিয়া থাকিবে এবং যত কিছু অস্ত্রই ইহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হউক না কেন, ইহার বিনাশ কখনও সম্ভব হইবে না। স্বাজাতিকতা অমর, স্বাজাতিকতার মৃত্যু হইতে পারে না; কারণ ইহা কোন মানবীয় বস্তু নহে, বাংলা দেশে স্বয়ং ভগবান কাজ করিতেছেন। ভগবানকে নিধন করা যাইতে পারে না,—কারাগারে আবদ্ধও করা যাইতে পারে না।

স্বদেশী যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-বেদ আকৃষ্ট করিল বাংলার যুব-সমাজকে। সেই মহাপুরুষের মানব-সেবার উদার নিষ্কাম নিঃস্বার্থ আদর্শে যুবকগণ অনুপ্রাণিত হইল। তাহারা জাতিধর্ম-নির্বিশেষে স্বদেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। বিবেকানন্দ-সাহিত্য তাহাদের প্রেরণা যোগাইল স্বদেশ ও স্বজাতির দুঃখ-দুর্দশা মোচনের ব্রত গ্রহণ করিতে। স্বামীজীর জীবনী, বাণী ও রচনাবলী বাংলার তরুণ দলের চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া দিল স্বদেশ-প্রেমের পূত মন্দাকিনী-ধারায়। দরিদ্রকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করিতে হইবে—এই শিক্ষা পাইয়াছে তাহারা বিবেকানন্দ-সাহিত্য হইতে। যুবকেরা অবগত হইল যে,—স্বামীজীর শিক্ষাদান কেবল প্রচারের

মধ্য দিয়া হইত না, আপনি আচরি ধর্ম তিনি পরকে শিখাইতেন। 'আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই'—এই স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রীতির অনুভূতি আমাদের প্রাণে জাগাইয়া দিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ। 'ব্রাহ্মণ ভারতবাসী' ও 'চণ্ডাল ভারতবাসীর' মধ্যে কোন ভেদ-জ্ঞান না করিয়া উভয়কে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন সেই মহাপুরুষ। তিনি প্রাণস্পর্শী ভাষায় আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন —"নীচ-জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

জাতীয় সাহিত্যের প্রগতি সাধন স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম অবদান। আন্দোলনের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য পর্বে জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, নাটক, যাত্রা, ইতিহাস ইত্যাদি বিবিধ রচনা যে বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, গিরীশ চন্দ্র ঘোষ, রজনীকান্ত সেন, প্রমথ রায়চৌধুরী, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মুকুন্দ দাস, ভূষণ দাস, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, নিখিলনাথ রায়, দুর্গাদাস লাহিড়ী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহিত্যিক-দান এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী যুগের জাতীয় সাহিত্যে কত অজানা কবির দানও রহিয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য পর্বে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল রাত্রিকালে বিহারের মজঃফরপুর সহরে বহু রাজনীতিক মামলার বিচারক ও দণ্ডদাতা কলিকাতার ভূতপূর্ব চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবকে (তৎকালে মজঃফরপুরের জেলা ও দায়রা জজ) নিধন করিবার জন্য যুগান্তর বিপ্লবী দলের ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকী বোমা নিক্ষেপ করে। যে ফিটন-গাড়ীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়,

তাহাতে কিংসফোর্ড ছিলেন না, ছিলেন তুইজন ইংরেজ মহিলা। তাঁহারা নিহত হইলেন। পরদিন ১লা মে ঘটনা-স্থল হইতে ২৪ মাইল দূরে ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে রিভলভার ও তাজা কার্তুজ সহ। মোকামা-ঘাট ষ্টেশনে প্রফুল্ল চাকী গ্রেপ্তার আসন্ন দেখিয়া পর-পর তুইটি গুলী ছুড়িয়া আত্মহনন করে। ৩রা মে হইতে কলিকাতার নানা স্থানে ও মফঃস্বলে খানাতল্লাসী চলে। উত্তর কলিকাতায় মাণিকতলা অঞ্চলে মুরারী পুকুর রোডে বারীনবাবুদের বাগান বাড়ীতে বোমার কারখানা ও অস্ত্রাগার আবিষ্কৃত হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে অরবিন্দ, বারীন্দ্র-কুমার, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ ভট্টাচার্য, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসু, নরেন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইলেন। মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপের ঘটনা হইতে সৃষ্টি হইল ইতিহাস-বিখ্যাত ষড়যন্ত্রের মামলা। আলিপুর দায়রা জজের আদালতে বিচার হইয়াছিল বলিয়া ইহা আলিপুর বোমার মামলা নামেও খ্যাত। পূর্বোক্ত ঘটনাবলী— বিশেষ করিয়া আলিপুর বোমার মামলা স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য শিক্ষিত-সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যাপক সঙ্ঘবদ্ধ গোপন প্রচেষ্টা ইহাই প্রথম। আসামীদের মধ্যে জমীদার-পুত্র নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী স্বীকারোক্তি করিয়া রাজসাক্ষী (Approver) হইল। কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু আলিপুরের জেলখানার ভিতরে ওই বিশ্বাসঘাতককে রিভলভারের গুলীতে নিধন করিলেন। বিচারে তাঁহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হয়; ক্ষত্রিয় বীরের মতো প্রসন্ন-চিত্তে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করিয়া তাঁহারা মৃত্যু বরণ করিলেন। মামলার প্রধান আসামী ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, তাঁহার মুক্তি হইল। বারীন, উল্লাসকর, উপেন

বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। আসামীদের মধ্যে আরও কয়েকজনের উপর দীর্ঘ সশ্রম কারাদণ্ড-ভোগের আদেশ প্রদত্ত হইল। দমন-নীতির এই প্রচণ্ড তাণ্ডবে বাংলার বিপ্লবপন্থী দলগুলির উপর কোন প্রতিক্রিয়া হইল না। বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিগুলির কার্য কঠিন বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও চলিতে লাগিল পূর্ণোদ্যমে। এই বিপ্লবীরা স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক হিসাবে শুধু উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া কাজ করিয়াছিলেন। বহু বিপ্লবীর রাজনীতিক জীবনের গোড়া পত্তন হইয়াছে স্বদেশী যুগে।

তৎকালে পূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজের আদর্শও প্রকাশ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক 'বন্দে মাতরম্', বাংলা দৈনিক 'সন্ধ্যা' ও 'নবশক্তি' এবং বাংলা সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' পত্রিকার মধ্য দিয়া ওই আদর্শ স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য পর্বে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতারা তাঁহাদের বক্তৃতায়ও পূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের সম্পাদিত 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার ভাষায় ভারতবাসীর রাজনীতিক লক্ষ্য—"Absolute autonomy free from foreign control." স্বদেশী আন্দোলনের অন্ত্য পর্বেও অরবিন্দ তাঁহার সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক "কর্মযোগিন্" এবং বাংলা সাপ্তাহিক "ধর্ম" পত্রিকার মাধ্যমে ওই আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। "An open letter to my countrymen" শীর্ষক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন :—"Our ideal is that of Swaraj or absolute autonomy free from foreign control."

বিলাতী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ যে-আন্দোলনের মূল

কথা, সেই আন্দোলনের সুযোগ বাঙ্গালী শিল্প-বাণিজ্য উন্নয়নের কাজে আশানুরূপ লাগাইতে পারে নাই। তবে সেই সময়ে কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য— এফ. এন. গুপ্তের কলম-পেনসিলের কারখানা, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি, প্রভৃতি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলার সেই স্মরণীয় যুগের কীর্তি উন্নত-শিরে বহন করিয়া আসিতেছে। বোম্বে আহমাদাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলের শিল্পপতিগণ স্বদেশী আন্দোলন চলিতে থাকা কালে (১৯০৫ খ্রীঃ আগষ্ট— ১৯১১ খ্রীঃ ডিসেম্বর) নূতন নূতন কটন মিল স্থাপন করিয়া বয়ন-শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন।

স্বদেশী আন্দোলনকে বাংলার রেনাশাঁ (Renaissance) বা নব-জাগৃতির আন্দোলন বলা যাইতে পারে। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য বিলাতী দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশ-জাত দ্রব্য গ্রহণ হইলেও, ইহার প্রয়োগ-ক্ষেত্র স্বতঃই প্রসারিত হইল। বিলাতী সভ্যতার মোহে যে সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের মোহ-ঘোর কাটিয়া গেল। আত্মসংবিৎ ফিরিয়া পাওয়ার পর অবধি বাংলার শিক্ষিত সমাজ বর্জন করিতে লাগিল—বিলাতী বেশভূষা, বিলাতী চাল-চলন, বিলাতী আচার-ব্যবহার এবং বিলাতের অন্ধ-অনুকরণের মনোবৃত্তি। ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য আদর্শকে নির্বিচারে গ্রহণ করার যে আগ্রহ ও আসক্তি ছিল, তাহা লোপ পাইল। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের উপর আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া কম হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে দ্রুত পরিবর্তন আনিল, তাহা অভূতপূর্ব ও অভাবনীয়; ইহাকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাঙ্গালীর চিন্তাধারা বহিতে লাগিল নূতন খাতে। বাঙ্গালীর দৃষ্টিভঙ্গী

পাশ্চাত্ত্য প্রভাব হইতে মুক্তি পাইল, বাঙ্গালীর বহির্মুখী গতি অন্তর্মুখী হইল। স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রদূত বলিয়া বন্দনীয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সমাপ্তি হয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজকীয় ঘোষণায় বঙ্গবিভাগ রহিত করিয়া দিবার সঙ্গে। আন্দোলন চলিয়াছিল ছয় বৎসর চার মাস কাল। জাতির জীবনে ইহা দীর্ঘ সময় বলা চলে না। বর্তমান বৎসরের (১৯৫৫ খ্রীঃ) ৭ই আগষ্ট সেই আন্দোলনের ৫০ বৎসর পূর্তি হইয়াছে। "স্বদেশী আন্দোলনের সুবর্ণ-জয়ন্তী" উপলক্ষে বাঙ্গালী সশ্রদ্ধ-চিত্তে স্মরণ করিবে সেই আন্দোলনের বিরাট অবদানের কথা।

—"বিঘ্ন দেখিয়া হঠিয়া যাওয়া, ভয় প্রদর্শনে ভীত হওয়া, প্রাণভয়ে কাতর হওয়া, লোকের প্রতিকূলতা-বশতঃ সংকল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা কাপুরুষতা।"

—শিবনাথ শাস্ত্রী

সঙ্গীত-আসর

'রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তান' বিষয়ক বিতর্কের দ্বার দিয়ে সাধারণভাবে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা গল্প-ভারতীর প্রাঙ্গণে, প্রবেশলাভ ক'রে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই নবোদ্‌ঘাটিত দ্বার যাতে পুনরায় রুদ্ধ হ'য়ে না যায় তদ্বিষয়ে আমরা বহু গ্রাহক এবং বন্ধুবর্গের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েছি।

সঙ্গীত মানুষের সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অংশ; বাঙালীর ক্ষেত্রে ত কথাই নেই। বাঙালীর সংস্কৃতিতে সঙ্গীত উত্তরোত্তর গুরু হ'তে গুরুতর স্থান অধিকার ক'রে চলেছে। কায়া এবং ছায়া অভিনয়ে আবহ-সঙ্গীতের ন্যায় বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন-অভিনয়েও সঙ্গীত অন্যতম রসপটভূমি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না হর্ষ-বিষাদের মধ্যে কোথাও সঙ্গীতের অবান্তরতা নেই।

এই বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীতকে শিক্ষণীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যে বস্তু মানুষের জীবনে ও সংসারে দুঃখের বিরুদ্ধে প্রতিষেধ রচনা করে, শিক্ষনীয় বস্তুর তালিকা হ'তে তাকে বাদ দিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ণ হয়। তা ছাড়া, সুরের সেতুর দ্বারা কণ্ঠ-সঙ্গীতের সহিত সাহিত্যের সাক্ষাৎ যোগ আছে। কণ্ঠ-সঙ্গীত সাহিত্যের একটা বিশেষ পল্লীর সুরেলা আত্মীয়। এ দিক দিয়েও সাহিত্য পত্রিকায় সঙ্গীত আলোচনার একটা সঙ্গত স্থান আছে।

এই সকল কারণের প্রতি সচেতন হ'য়ে আমরা গল্প-ভারতীতে 'সঙ্গীত-আসর' নামে একটি স্থায়ী সঙ্গীত বিভাগ চালনার ব্যবস্থা করেছি। বাঙলাদেশের জনপ্রিয় গায়ক, পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত, নাট্য, নৃত্য সংসদের সঙ্গীত বিভাগের পরিচালক, সঙ্গীত রত্নাকর শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বিভাগটির পরিচালনা করতে সম্মত হ'য়ে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। অপরাপর কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞের নিকট হ'তেও আমরা সদয় সহযোগিতার আশ্বাস লাভ করেছি।

'সঙ্গীত-আসরে' একটি ক'রে উৎকৃষ্ট গানের স্বরলিপি দেওয়া হবে; অধিকন্তু দেওয়া হবে স্বরলিপিকৃত গানটি সম্বন্ধে সাধারণ ব্যাখ্যা; রাগ-সঙ্গীতের স্থলে দেওয়া হবে রাগের পরিচয়, আলাপ, বিস্তার ইত্যাদি। তাছাড়া, সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা ক'রে মনোজ্ঞ এবং শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধও থাকবে। বলা বাহুল্য আমাদের সঙ্গীত-আসর কোন বিশেষ সঙ্গীত শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না; ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্‌পা, ঠুন্‌রি, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, অন্যান্য বাঙলা গান, ভজন, কীর্তন, লোক-সঙ্গীত প্রভৃতি সকল শ্রেণীব গানই সঙ্গীত-আসরে স্থানলাভ করবে।

বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অপরাপর সঙ্গীতায়তনে পরীক্ষার জন্য যাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন 'সঙ্গীত-আসর' তাঁদের যাতে বিশেষ উপকারে লাগে সেদিকে ত দৃষ্টি রাখা হবেই, অধিকন্তু সর্বসাধারণও এই বিভাগের সাহায্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন এবং গানের সঞ্চয় বর্ধন করতে পারবেন। সঙ্গীতের রস পরিপূর্ণ উপভোগের জন্য সঙ্গীত সম্বন্ধে যেটুকু প্রাথমিক এবং মৌলিক জ্ঞান একান্ত আবশ্যক 'সঙ্গীত-আসর' সঙ্গীত রসপিপাসুগণকে সেই জ্ঞান সরবরাহ করবে।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ গায়ক সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ ক'রে সদারঙ্গের বিখ্যাত ধ্রুপদ 'সব বনমে কৈসে শোহে' গানটির স্বরলিপির দ্বারা 'সঙ্গীত-আসর' বিভাগের উদ্বোধন করলেন। তদীয় পুত্র শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরলিপির শেষে রাগ বাহারের পরিচয় এবং আলাপাদি সংযোজিত ক'রে উক্ত রাগ সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদান করেছেন।

সম্পাদক—গল্প-ভারতী

বাহার—চৌতাল

সব বনমে কৈসে শোহে ঋতুরাজ দিন আয়ে
মন্দ মন্দ পবন বহত, বহু বরণ হোয়ে সুমন।
কোয়েলা পাপেয়া বনমে, গাবে নিকি নিকি তান
ভঁবর সব গুঞ্জার, কহিয়ত য়হ লগন।
অধিক শোহে বৃন্দাবন, যহাঁ বৈঠে রাধা শ্যাম
দ্বৌ রূপ ঐসে ঝলক, যৈসে চন্দ্র গগন।
সদারঙ্গ কো প্রভু আজ, লেতহিঁ মুরলী সাজ
বাজাবে পঞ্চম রাগ, সুর নর হোয়ে মগন॥

—সদারঙ্গ

স্বরলিপি—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত-নায়ক

অস্থায়ী—

১		০		২		০	
পা	র্সা	র্ণা	পা	মা	-া	মা-	পধা
স	ব	ব	ন	মে	০	কৈ ০	০

৩		৪		
মপা	পা	মজ্ঞা	-া	I
সে ০	শো	হে ০	০	

১´		০		২		০		৩	
মজ্ঞা	মা	ণা	ণধা	ণধা	না	র্সনা	র্রা	র্সনা	র্সা
ঋ ০	তু	০ রা	০	০ ০	জ	দি ০	০	ন ০	আ

৪		
ণধা	।	I
য়ে ০ ০		

১´ | ০ | ২ | ০
না- র্সা | র্সা র্সনা | র্সা র্সা | ণ-ধা ধমা |
ম ০ | ন্দ ম ০ | ০ ন্দ | প ০ ব ০ |

৩ | ৪
ণধা না | র্সা র্সা I
ন ০ ব | হ ত

১´ | ০ | ২ | ০
র্সনা র্রা | র্রা র্রা | র্রজ্ঞা র্সা | র্স নর্রা |
ব ০ হু | ব র | ০ ০ ণ | হো ০ ০ |

৩ | ৪
র্সনা র্সা | ণধা ণমা II
য়ে ০ সু | ম ০ ন ০

অন্তরা

১´ | ০ | ২ | ০
মা - া | মা ণা | ধা না | নর্সা - া |
কো ০ | য়ে লা | ০ পা | পৈ ০ ০ |

৩ | ৪
র্সনা র্সা | র্সা র্সা I
য়া ০ ব | ন মে

১´ | ০ | ২ | ০
র্সনা র্রা | র্রা - র্জ্ঞা | র্রা র্সা | র্সনা র্র র্সা |
গা ০ ০ | বে ০ | নি কি | নি ০ কি০

৩ | ৪
ন র্সা ণা | ধা ধা I
০ ০ তা | ০ ন

১´ ধা ণা | ০ র্সা´ র্মজ্জ´ | ২ মা´ পা´ | ০ মজ্জা´ -া |
ভ ব | র স ০ | ০ ব | গু ০ ০ |

৩ া জ্জমা´ | ৪ রা´ সা´ I
০ ঞ্জা ০ | ০ ব

১´ র্সণা রা´ | ০ জ্জসা´ রা´ | ২ া সা´ | ০ র্সনা রা´ |
ক ০ হি | ০ ০ য় | ০ ত | য় ০ ০ |

৩ র্সনা সা´ | ৪ ণধা ণমা II
হ ০ ল | গ ০ ন ০

সঞ্চারী

১´ সণ্‌া সণ্‌া | ০ সা সমা | ২ -া মা | ০ মা -া |
অ ০ ধি ০ | ক শো | ০ হে | বৃ ০ |

৩ মা পা | ৪ মজ্জা জ্জা I
ন্দা ০ | ব ০ ন

১´ মজ্জা মা | ০ ণা ণা | ২ ণধা ণা | ০ পা পর্সা |
য ০ হাঁ | ০ বৈ | ০ ০ ঠে | রা ধা ০ |

৩ া র্রসা | ৪ ণা ধা I
০ শ্যা ০ | ০ ম

১´	০	২	০	৩
ণা ণধা	ণা পা	মা পা	মা পা	মজ্ঞা মা
দ্বো ০ ০	০ রূ	০ প	ঐ ০	সে ০ ঋ

৪
পা পা I
ল ক

১´	০	২	০	৩
মা ণা	পা মজ্ঞা	মা পা	মজ্ঞা মজ্ঞা	মা রা
গৈ ০	সে চ ০	০ ন্দ্র	গ ০ ০ ০	০ গ

৪
া সা II
০ ন

আভোগ

১´	০	২	০	৩
মা মা	ণধা না	র্সা র্সা	র্সা র্সা	া র্সনা
স দা	০ ০ র	ঙ্গ কো	প্র ভু	০ আ ০

৪
র্সা র্সা I
০ জ

১´	০	২	০	৩
র্সনা র্রা	-া র্রজ্ঞা	র্রা র্সা	র্সনা র্রা	র্সনা র্সা
লে ০ ০	০ ত ০	০ হি	মূ ০ র	লী ০ সা

৪
ণা ধা I
০ জ

১—		০		২		০	
ধা	ণা	সা´	র্মজ্ঞা´	মা´	পা´	র্মজ্ঞা´	র্মজ্ঞা´
বা	জা	০	বে ০	০	প	ঞ্চ ০	ম ০

৩		৪	
র্মজ্ঞা´	রা´	।	সা´ I
০ ০	রা	০	গ

১´		০		২		০	
র্সনা	রা´	রা´	রা´	জ্ঞসা´	- ।	র্সনা	রা´
সু ০	র	ন	র	০	০	হো ০	০

৩		৪	
সনা´	সা´	ণধা	ণমা II II
য়ে ০	ম	গ ০	ন ০

বাহার—আলাপ

স ম, ম প জ্ঞ ম, জ্ঞ, র স, ধ্ ণ্ স ম, ম প, ম ণ ধ ম প জ্ঞ, ম, ণ ধ, ধ ন র্স ণ প ম, জ্ঞ ম প, জ্ঞ ম র স॥ ম ণ ধ ন র্স, র্স ণ ধ ন র্স, ধ ণ র্র, র্স র্জ্ঞ, র্র র্স, ণ ধ ণ র্র, র্স, ধ ণ র্স র্ম, র্ম র্জ্ঞ র্ম র্জ্ঞ র্র, র্স ণ র্র, র্স র্র র্জ্ঞ, র্র র্স, ণ র্স, ণ ধ, ম ম, প প, ধ ধ, ণ ণ, র্স, ণ প ম, জ্ঞ, ম প, জ্ঞ ম জ্ঞ র স॥

যুগধর্ম্ম ও সঙ্গীত

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা প্রশ্ন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলে সঙ্গীতের চিরন্তন ধারাকে যুগ মানবে, না সঙ্গীত যুগধর্ম্মকে মেনে চলবে। তর্কে সমস্যার সমাধান হয় না। ইতিহাসকে প্রামাণ্য ধরলে বোঝা যায় পরিবর্ত্তনশীল জগত যুগের আদর্শকে অনুসরণ করে। প্রগতিশীল চিন্তাধারা ব্যাহত হয়, যখন অন্ধ বিশ্বাস প্রচলিত ধারাকেই আঁকড়ে ধরে রাখে। সঙ্গীতের মূল রূপ শাশ্বত, কিন্তু কালোপযোগী ভাবধারার স্পর্শে তার বিকাশ হয় অভিনব। এই অভিনবত্ব মূল রূপেরই যুগোপযোগী রূপান্তর। এই নব-সৃষ্টির প্রবাহ চিরন্তন। যুগে যুগে তার স্মারক চিহ্ন রেখে যায়। যুগের আহ্বান সকলকেই শুনতে হয়,—তার প্রেরণাকে অন্তরে নিতে হয় নতুবা পথ হারিয়ে পিছিয়ে পড়ে থাকতে হয়। সেইজন্য দেখা যায় সঙ্গীত এবং অন্যান্য ললিতকলা যুগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে।

ভারতীয় সঙ্গীতের একটা বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে। গৌরবান্বিত অতীতই তার একমাত্র পরিচয় নয়। অনাগত যুগের নব উন্মেষের আশায় সঙ্গীত চিরদিনই প্রতীক্ষামান। ভারতের সঙ্গীত অতীতকে রক্ষা করেছে এবং নূতনকেও বরণ করে নিয়েছে। আলোচনা করলে জানা যায়, অতীতে অনুশীলনের মধ্যেই অনাগত ভবিষ্যতের আদর্শ নিহিত আছে এক যুগের আদর্শকে বুঝতে পরবর্ত্তী বহু যুগ কেটে যায়।

যুগের সঙ্গে সঙ্গীতও পরিবর্ত্তনশীল। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস

শুধু বৈচিত্র্যময় নয়, রহস্যময়। কালের স্রোতে যা ভেঙেছে, গড়ে উঠেছে তার চতুর্গুণ। সেই আদিম যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সঙ্গীত সকল যুগের অল্প বিস্তর নিদর্শন রক্ষা করে এসেছে। নব-সৃষ্টির প্রতীক স্বরূপ যুগমানবের আবির্ভাব হয়। প্রতিভাবান শিল্পীগণের সমন্বিত প্রচেষ্টা তার অবদানকে সার্থক করে তুলে। হিন্দু সঙ্গীত সংস্কৃতির চরম নিদর্শন—ধ্রুপদ সঙ্গীত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যুগমানব তানসেন ধ্রুপদ সঙ্গীতধারায় আনলেন এক অভিনব রূপ। তানসেন প্রচলিত ধ্রুপদ সঙ্গীতধারায় সে যুগের ছাপ পড়ল। মোগলযুগের শিল্পকলার প্রভাব সঙ্গীতকে অলঙ্কৃত করল। সঙ্গীতের মধ্যে এল কত সুর বৈচিত্র্য। সুদূর পারস্য থেকে কত সুরের রেশ এল ভারতে। ভারত তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। সেই সুর দেশীয় সুরের সহিত মিশে গেল।

তানসেন প্রবর্ত্তিত সঙ্গীতধারা সঙ্গীত ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ। তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীতের গবেষণা এখনও চলছে এবং তাঁর রচিত বহু অমূল্য সম্পদ আজও অনাবিষ্কৃত। প্রাগ্ তানসেন যুগের সংস্কৃত শব্দ বহুল ধ্রুপদ সঙ্গীত রূপান্তরিত হল বৈচিত্র্যময় সুর-লহরীতে। তানসেন তাঁর প্রিয় রাগ দরবারী কানড়া'তে দিলেন অপরূপ সুর সমাবেশ। তাঁর সৃষ্ট বহু রাগ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদর্শ হল। তাঁর অনন্যসাধারণ সুর কল্পনায় ধ্রুপদ নবরূপে রূপায়িত হল। তাঁর গানে মীড়, গমক, আশ প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রাচুর্য দেখা যায়। যুগধর্ম্ম তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তাই তিনি পূর্ব্ব প্রচলিত ধ্রুপদ গানের প্রথাকে পরিবর্ত্তন করেছিলেন; এবং সঙ্গীত রাজ্যে হয়েছিলেন একচ্ছত্র সম্রাট। আলাপ পদ্ধতিকেও তিনি নবরূপে সজ্জিত করেছিলেন। তাঁর প্রচলিত আলাপ-পদ্ধতি এখনও ভারতের কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘরানা গায়কের কণ্ঠে শোনা যায়। গবেষণার দ্বারা প্রমাণ হয় যে তানসেন প্রবর্ত্তিত ধ্রুপদকেই ভিত্তি করে

ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন প্রকার ঢংয়ের সঙ্গীত, যথা—ধামার, খ্যাল, টপ্পা প্রভৃতির উদ্ভব হয়। খ্যাল, টপ্পা, ঠুম্‌রী প্রভৃতির সৃষ্টি ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ। বিভিন্ন যুগে নব-সৃষ্টি সঙ্গীতকে করেছে প্রগতিশীল। আজকের দিনেও সঙ্গীতকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। বহু যুগ ব্যাপী ভারতীয় সঙ্গীত জনসমাজের সহিত বিচ্ছিন্ন থাকার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন মতবাদ। যথাযথ আদান প্রদানের অভাবে বিভিন্ন ঘরানার মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন যোগ, তার সূত্র হারিয়ে গেছল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের স্বাতন্ত্রতা এবং সাধারণ জনসমাজে প্রচলন না থাকার ফলেই নানাবিধ মতবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। সঙ্গীতের বিচারের মাপকাঠি ছিল রাজদরবারের হাতে, এখন সে মাপকাঠি এসেছে জনসাধারণের হাতে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তুলতে হলে বর্তমান যুগের দাবীকে মান্‌তে হবে। ধ্রুপদের মধ্যে আন্‌তে হবে মাধুর্য্য, খ্যালের মধ্যেও তাই। Techniqueকে রাখতে হবে গৌণ করে। ধ্রুপদ এবং খ্যালে দিতে হবে কাব্যের স্থান। গানের অংগ কাব্য ও সুরের সমন্বয়। এর মধ্যে একটিকে বাদ দিলে সঙ্গীতের অঙ্গহানি হবে। বাঙলাদেশে এতদিন সঙ্গীত প্রবেশিকা পরীক্ষার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল কিন্তু সম্প্রতি ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবেশিকা বিভাগে সঙ্গীত আশানুরূপ জনপ্রিয় হয়নি একথা সকলেই স্বীকার করবেন। ব্যাপকভাবে সঙ্গীত শিক্ষিত সমাজে প্রচলন করতে হলে সঙ্গীতকে করে তুলতে হবে আকর্ষণীয়। অনেক সময় শাস্ত্রের বোঝা শিক্ষার্থীর মনে ভীতি সঞ্চার করে। শাস্ত্র শিল্পকে অনুসরণ করে, শিল্প শাস্ত্রকে নয়। অনেক সময় প্রথম থেকেই শাস্ত্রের কঠোর শাসন সঙ্গীতকে করে তুলে নীরস। শিক্ষার্থীর মনে আনতে হবে অনুপ্রেরণা, সে অনুপ্রেরণা আসবে সুরে, কাব্যে ও ছন্দে। আর একটা বিষয় বলা

প্রয়োজন, সঙ্গীত শিক্ষা সামান্য দুই একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ব্যাপকভাবে শিক্ষাই হবে শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের বাঙলা দেশে সঙ্গীত শিক্ষা ক্ষেত্রে বাঙলার নিজস্ব সঙ্গীতের পূর্ণ মর্য্যাদা দেওয়া অতীব প্রয়োজন।

রাগ-রাগিণী ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে, কীর্ত্তন এবং বাঙলার নিজস্ব ভাবধারা সমন্বিত বিভিন্ন শ্রেণীর গান শিক্ষা করা উচিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচিত উচ্চাঙ্গ ধর্ম্ম সঙ্গীত ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমপর্য্যায়। ভারতীয় সঙ্গীত বলতে তার সুর, তাল ও ছন্দকেই বুঝায়। ঐ আদর্শকে রক্ষা করে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচলন ও শিক্ষাদান সঙ্গীতকে করে তুলবে জনপ্রিয়।

—"লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই। একটা লোক-শিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সেদিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী-পিঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকা-মালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস নুদুস কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেম-প্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ-সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙল চষে, যে তূলা পেজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না, সেও শিখিত।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

মেঘ-মঙ্গল

হাসি ভট্টাচার্য

বাঙলাদেশের প্রকৃতি আছেন বাঙালীর অন্তর জুড়ে। প্রকৃতির সঙ্গে বাঙালীর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। আজকের প্রসারিত জীবনে যেখানে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যক্ষদৃষ্টি এনে দিয়েছে সেখানেও আমরা প্রকৃতির প্রভাবকে একেবারে ছেঁটে ফেলতে পারিনি আমাদের জাতীয় জীবন থেকে। তাই প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতিকে আমরা আহ্বান জানাই আমাদের লোক-জীবনে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে ১০৫°, ১০৬° ডিগ্রি উত্তাপে যখন নাগরিক জীবনে আমরা air-conditioned সিনেমা হলে ঢুকে গরমের তাপকে সহনীয় করবার চেষ্টা করি, কিংবা খস্‌খসের পর্দা টাঙিয়ে তাতে জল ছিটিয়ে মোটরে চলি, ঠাণ্ডা হাওয়াযুক্ত অফিসে কাজ করি কিংবা ঘরের মধ্যে বিজলী পাখার পয়েণ্ট বাড়িয়ে দিই তখনও তারই মধ্যে ছেলে-মেয়েদের কলধ্বনি শুনি 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে—'

প্রচণ্ড গরমে এই বৃষ্টিকে আহ্বান আমাদের প্রকৃতি-প্রিয় চিত্তের প্রকৃতি-পূজারই নামান্তর। লোক-জীবনে সমস্ত গ্রাম জুড়ে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি আহ্বানের বা মেঘবন্দনার সুর শোনা যায়। চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি গ্রামের কৃষক থেকে সুরু করে গ্রামের সাধারণ লোকও বৃষ্টি বা মেঘকে আহ্বান জানায়। 'ধান দেব মেপে—' অর্থে বৃষ্টি হলে মাঠে ভালো ফসল হবে এবং তা থেকে সম্বৎসরের খাদ্য সঞ্চিত হবে। শুধু আতপ-তাপের ক্লেশ নিবারণই নয়, তার সঙ্গে ছোট ছোট গানের

ছড়ায় থাকে সমগ্র জাতির জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনের দাবি। ভাল বৃষ্টি হলে ভাল ফসল হয়। ভাল ফসল হলে জাতীয় সমৃদ্ধি বাড়ে।

বৈজ্ঞানিক যুগে মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কৃত্রিম মেঘের আবহাওয়া তৈরী করে অধুনা বৃষ্টি নামানোর প্রচেষ্টা চলছে। গ্রাম্যচাষী কিন্তু প্রাণের আবেগে প্রকৃতি-নিষ্ঠায় সেক্ষেত্রে প্রকৃতির পূজা করে। কত পূজা পাল-পার্বনের অনুষ্ঠান করে থাকে গ্রাম্যচাষী এবং লোক সম্প্রদায় এই উপলক্ষ্যে।

রাজার মত ঐশ্বর্য হচ্ছে মেঘের। মেঘ তাই রাজা, মেঘ থেকেই বৃষ্টি, আর বৃষ্টির ধারায় সুস্নাত ধরণী। মেঘ জীবধাত্রী, প্রকৃতির এই করুণাধারায় প্রতিপালিত জীবজগতের অধিবাসী, মেঘের মহিমাকে উপলব্ধি করেই পল্লী-কবি মেঘকে রাজা আখ্যা দিয়েছে। ভারতীয় কাব্যে মেঘ-বন্দনায় কবি কালিদাস থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মেঘস্তুতি গেয়েছেন। মেঘ হচ্ছে রাজা। রাজার মতই তার মহিমান্বিত রূপ, গ্রামের কবি-কল্পনাতেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তবে গ্রাম্য কবি-মানসে মেঘ শুধু রাজাই নয়, মেঘ আরও আপন জন। মেঘ হচ্ছে সহোদর, পল্লীকাব্যে মেঘ-রাজার গানে তাই শোনা যায়—

> "মেঘ রাজারে তুই ন আমার ভাই
> আরও ফটিক ডলক দে, চিনার ভাত খাই।"

চিনা একরকমের ধান। চিনা ধানের অন্নলোভী পূব বাংলার কৃষক সম্প্রদায় মেঘ আহ্বানে মেঘকে রাজ আখ্যায় স্তুতিবাদ করে। চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড গরমে ক্ষেত-মাঠ যখন খাঁ খাঁ করে—খাল, বিল,

পুকুর যখন জলশূন্য, তৃষ্ণার শান্তি মেঘকে তখন বর্ষামঙ্গলের সুরেই পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে আহ্বান জানান হয়—"ও মেঘ আইস বৃষ্টির পানি হইয়ারে।"

মেঘ-বন্দনায় গ্রাম্যকবি কণ্ঠে শোনা যায়—

"কাজলা ম্যাঘা নামো নামো কালো কাজল নিয়া
পানির ঝলক বইয়া আনো তোমার দিব বিয়া
রাঙা টুকটুক বউগো তোমার রাঙা ম্যাঘারাণী
এই বারেতে সদয় হইয়া ফালাও তোমার পানি।"

কালো মেঘের আগমনে বাংলার কৃষক জীবনে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। ফসল ভরে উঠবে মেঘের জলে, সারাবছরের খাদ্য সঞ্চিত হবে, পূর্ববঙ্গের কৃষক সম্প্রদায় তাই মেঘের স্থায়িত্ব কামনা করে।

"আকাশে বসতি করো সারা দিনমান
কাইলা মেঘে বসত কর শুনাও তোমার গান।"

জীবনের প্রয়োজনে মেঘ-মঙ্গল পূর্ববঙ্গের পল্লী-গীতিতে সমধিক প্রচলিত। মাঠে মাঠে আউসের ক্ষেত জলপূর্ণ, নতুন ফসলের আশায় কৃষককুলে আনন্দের সাড়া, নতুন ধানে নবান্নের আশ্বাস, কবির ভাষায় —'আইল ঋতু বরষা চাষার হইল ভরসা।'

মেঘ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবর্ষার ঘনীভূত রূপ—পূর্ব-বাংলার গ্রামে গ্রামে উৎসবের সাড়া পড়ে যায়। পল্লীকবি মেঘ-মঙ্গলের বন্দনা গান গায়—

"কাইলা ম্যাঘা আইলা রে
ধইলা ম্যাঘা আইলা রে
মেঘরাজা আইলা রে বাজান্।"

মেঘকে ঘিরে মেঘ-মঙ্গলের প্রশস্তি গানের আর অন্ত নেই পূর্ব-বাংলা। সহজ সরল সুরে কত গানের কলকাকলি স্ফুরিত হয়।

পূর্ববঙ্গের মেয়েরা মেঘের ব্রত করে ; মেঘের প্রশস্তি গায়—

"আয় মেঘ আয়, আমার সোনার গায়,
রূপা দিয়া বাইন্ধা দিমু তোমার কালো নায়।"

মেঘ-মঙ্গলের গানে মেঘ আহ্বান থেকে সুরু করে, মেঘের স্থিতি কামনা এবং পরিশেষে মেঘ-বিদায়ের সুর গ্রাম্য-গীতিতে, ছড়ায়, কবিতায় শোনা যায়। চারিদিক থেকে মেঘকে আহ্বান করে দিক বন্দনার গান করা হয়। পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—এই চারদিকের মেঘকে বেঁধে রাখা হয় সুবৃষ্টির প্রত্যাশায়। অতিবৃষ্টিতে যখন খাল-বিল নদী-নালা ভরে যায়, ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা যায় তখন চারিদিকের বদ্ধ-মেঘকে আবার মুক্ত করে দেওয়া হয়। মেঘমুক্তি গানে তখন শোনা যায়—

"পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ খুললাম চারটী দ্বার
যেথান দিয়া ইচ্ছা তোমার যাও মেঘনা পার।"

বর্ষার শেষে শরতের আকাশে কালো মেঘ যখন সাদাটে রঙ ধরে—বর্ষার প্রয়োজন তখন মিটে যায়, মেঘকে অভিনন্দন জানিয়ে মেঘের প্রয়োজনকে স্বীকার করে মেঘ-মঙ্গলের পল্লীকবি মেঘ-বিদায়ের গান গায়—'যাওরে মেঘ আর এক গায়।'

—"হে ভারতবাসী, মনে রাখিও—তুমি জন্মিয়াছ নিজের জন্য নয়, জননী জন্মভূমির জন্য।" স্বামী বিবেকানন্দ

(২০৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথা

—"গোবিন্দপাদ একদিন শঙ্করকে সম্বোধন করে বললেন, 'বৎস শঙ্কর! শোন, আজ আমি তোমায় শেষ বক্তব্য বলব। আমি বুঝছি তোমার শিখবার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, তুমি নিজেই বোধহয় তা বুঝছ। বল দেখি তোমার আর কোন অভাব আছে কিনা?' শঙ্কর গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করে মস্তক অবনত করে রইলেন। মৌন দ্বারা সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। কিন্তু ইচ্ছা তাঁর শঙ্করের মুখ হতে তা শোনেন। অতএব তিনি পুনরায় শঙ্করকে বললেন, 'বল বৎস! তোমার আর কোন সন্দেহ আছে কি না? তোমার প্রাপ্তব্য আর কিছু আছে বলে কি বোধ হয়?' শঙ্কর তখন অবনত মস্তকে ঈষৎ হাস্য করে বললেন, 'ভগবন্! আপনার কৃপায় আমার আর জ্ঞাতব্য কিছুই নাই। আপনি অনুমতি করলে আমি ব্রহ্মতত্ত্বে চিরতরে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হই।'

গোবিন্দপাদ একথা শুনে যারপরনাই সন্তুষ্ট হলেন এবং কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বললেন, 'বৎস শঙ্কর, তুমি বৈদিকধর্ম্ম রক্ষার্থ ভগবান্ শঙ্করের অংশে জগতে অবতীর্ণ হয়েছ। তোমার এই দেহগ্রহের মূল সেই ভগবান শঙ্করের ইচ্ছা। তোমার কাজ সেই শঙ্করের কাজ হবে। তোমার এই আগমনবার্ত্তা আমি গুরু গৌড়পাদের নিকট শ্রবণ করেছি। তোমাকে সম্প্রদায়ক্রমে রক্ষিত সেই অদ্বৈতব্রহ্মবিজ্ঞান দেবার জন্য আমি গৌড়পাদেরই আদেশে প্রায় সহস্র বৎসরকাল অপেক্ষা করে আসছি। নচেৎ আমি জ্ঞানলাভসমকালেই বিদেহমুক্তি লাভ করতাম। এক্ষণে আমার কাজ শেষ হয়েছে। আমি আর এদেহ রক্ষা আবশ্যক বিবেচনা করিনা। তুমি এক্ষণে কাশী যাও। সেখানে তুমি ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের দর্শনলাভ করবে এবং তিনি তোমায় যেরূপ করতে বলবেন তাই তুমি করো। আমার মনে হচ্ছে তিনি তোমায় মহামুনি ব্যাস

বিরচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যও রচনা করে অদ্বৈতব্রহ্মাত্মজ্ঞান প্রচার করতে আদেশ করবেন। কারণ এসময় অবৈদিক নানা ধর্ম্মমত, অতীব সূক্ষ্ম দার্শনিকতত্ত্ব প্রচার করে জনসাধারণকে এমনই বিমোহিত করেছে যে, তাদের তর্কজাল ভেদ করে পরমাত্মতত্ত্ব অবধারণ করা তাদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। কেবল এ নয়, বেদসেবী মীমাংসকগণও এতই কর্ম্মকর্ত্তব্যতা প্রচার করছেন যে, বেদের জ্ঞানকাণ্ড বিলুপ্ত হতে বসেছে। এসময় ভগবদবতার ভিন্ন ধর্ম্মরক্ষা অসম্ভব। তুমিই সেই জ্ঞানগুরু শঙ্করাবতার, তুমিই সেই কাজ করে এসেছ। তোমাকে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্য গুরু গৌড়পাদের আদেশে আমি এতকাল অপেক্ষা করছিলাম। আজ তা পূর্ণ হয়েছে, তোমরা যোগিজনোচিত আমার সৎকার করো।”

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কথা

“শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন। রামচন্দ্র খান মহাপ্রভুর সেই আর্তি দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মনে মনে চিন্তা ক'রছেন আর তিনিও কাঁদছেন

‘কোন্ মতে এ আর্ত্তির হয় সম্বরণ।
কান্দে আর এইমত চিন্তে মনে মন॥
ত্রিভুবনে হেন আছে দেখি সে ক্রন্দন।
বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠ পাষাণের মন॥’

কিছু স্থির হয়ে বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামচন্দ্র খানকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কে?’ রামচন্দ্র খান দণ্ডবৎ ক'রে করযোড়ে বললেন, ‘প্রভু! আমি আপনার দাসের দাস।’ সেই সময় সমবেত

অন্যান্য সকলে রামচন্দ্র খানের পরিচয় দিয়ে বলতে লাগলেন, 'প্রভু, ইনিই দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী।' সেই কথা শুনে মহাপ্রভু বললেন, 'তুমিই দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী। বড়ই ভাল কথা। আমি শীঘ্র নীলাচলে গিয়ে কেমন করে শ্রীজগন্নাথের চাঁদমুখ দেখতে পারি তার উপায় বল দেখি?' শ্রীজগন্নাথের নাম উচ্চারণ মাত্রেই মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হল, প্রেমে মূর্চ্ছিত হ'য়ে ভূমিতে পরলেন। এই প্রকারে অনেকক্ষণ কেটে গেল, তারপর মহাপ্রভু প্রকৃতিস্থ হ'লে রামচন্দ্র খান করযোড়ে নিবেদন করলেন, 'প্রভু, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করবার চেষ্টা করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু প্রভু এখন বিষম সময় উপস্থিত। আমাদের রাজা বঙ্গদেশাধিপতি হুসেন শাহার সঙ্গে উড়িস্যাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রবল যুদ্ধ চ'লেছে, সেইজন্য এখন বাংলাদেশের লোক উড়িস্যায় যেতে পারে না, উড়িস্যার লোক বাংলায় আসতে পারে না। রাজারা সব স্থানে স্থানে ত্রিশূল বসিয়েছে, পথিক গেলে "জাশু" বলে তাদের প্রাণ বধ করে। তবু আপনাকে কোন দিক দিয়ে লুকিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়ত করতে পারি, কিন্তু প্রভু মনে বড়ই ভয় হয়, আমিই বাংলারাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশের মন্ত্রর, এখানকার সব ভার আমার, রাজা যদি কোন প্রকারে জানতে পারে তাহ'লে নিশ্চয় আমার প্রাণ যাবে।'এই বলে রামচন্দ্র খান পুনরায় বললেন,'আমার ভাগ্যে যা হয় হোক, আপনার আজ্ঞা নিশ্চয় পালন ক'রবো। আমাকে যদি ভৃত্য বলে জ্ঞান করেন তাহলে গণ সঙ্গে ভিক্ষা (ভোজন) ক'রে অবস্থান করুন, আমার জাতি ধন প্রাণনাশ হয় হোক আজ রাত্রে আমি নিশ্চয় আপনাকে পাঠাব।'

রামচন্দ্র খানের এই উক্তি শুনে বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বড়ই সুখী হ'লেন, মৃদু হেসে তার প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত ক'রলেন।

আমাদের খাওয়া-পরায় বিজাতীয় প্রভাব

[জাতি হিসেবে ভারতবর্ষের বিশেষ এক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আছে, যা সে আজ হারাতে বসেছে। আজ আমাদের অনেকেরই আচারে-ব্যবহারে এমনি পরিবর্ত্তন এসেছে যে, তার ফলে আমাদের বৈশিষ্ট্য লোপ পেতে বসেছে। দীর্ঘকালের পরাধীনতা—হয়তো এই কারণে বাইরের প্রভাব এসে পড়েছে আমাদের ওপর, কিন্তু সেই প্রভাবকে অতিক্রম করবার মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছি ব'লেই আমরা আজ এমন ক'রে আমাদের জাতীয়তাকে বিসর্জন দিতে বসেছি। অনুকরণপ্রিয় জাতির অবনতি ও বিলুপ্তি তো এমনি করেই আসে। এই একই কারণে ভারতবাসী হারিয়েছে তার অনেক কিছু—তার শিল্প বাণিজ্য, এমন কি, তার সামাজিক পরিবেশ পর্য্যন্ত। এই মানসিক অপমৃত্যুর হাত থেকে জাতিকে বাঁচাতে হ'লে আজ তাকে ফিরে যেতে হবে তার অতীতের আদর্শের মধ্যে, খুঁজে দেখতে হবে, কি ছিলো আর কি সে হারিয়েছে। আজ আমরা ভুলে গিয়েছি কি ছিলো আমাদের রীতি-নীতি, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা আর আমাদের খাওয়া-পরা; সেইসব কথাই—বিশেষ ক'রে আমাদের খাওয়া-পরার সম্বন্ধে অতীতের চিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলাই হবে এ বিভাগের উদ্দেশ্য।]

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পথ দিয়ে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চলেছেন। গায়ে চাদর, পরণে ধুতি, পায়ে কট্‌কা চটিজুতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর

মূর্তিমান বিদ্রোহ! কারণ সে যুগে ছিলো ইংরিজিয়ানার যুগ। সাহেবি খানা আর সাহেবি পোষাকে কেতা-দুরস্ত বাঙালী!

একখানা জুড়ি-গাড়ী সশব্দে এসে দাঁড়ালো, তাঁর সামনে। গাড়ি থেকে নামলেন সে যুগের নতুন সাহেব মাইকেল মধুসূদন দত্ত। পণ্ডিত মশাইকে প্রণাম ক'রে তিনি বললেন, গাড়িতে উঠুন।

পথের লোক দাঁড়িয়ে দেখলো সাহেবের কাণ্ড। পণ্ডিত মশাই হেসে বললেন, এইটুকু পথ যাবো, তার জন্যে আর গাড়ি কেন?

মধুসূদন বললেন, তাহলে যে আমিও গাড়িতে উঠতে পারি না।

সেদিন পথের দু'ধারের লোক দাঁড়িয়ে যে-দৃশ্য দেখেছিলো, সে-দৃশ্য আজকের মানুষের কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু। আজ যাঁর কথা বলছি, সমগ্র জাতির প্রণম্য তিনি। তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

একবার এক মুসলমান মৌলবীকে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, সবাই কোট-প্যাণ্ট ধরেছে, তুমি ধরলে না কেন?

মৌলবী সাহেব হেসে বললেন, আপনিই বা ধরেন নি কেন?

বিদ্যাসাগর বললেন, আমাকে ও-পোষাকে মানাবে না।

মৌলবীও হাসলেন। বললেন, আমাকেও মানায় না।

বিদ্যাসাগর মশায় মৌলবীকে জড়িয়ে ধরলেন।

এঁরা ছিলেন জাতির প্রতীক। তাই জাতীয় পোষাক কোনদিন কোন কারণেই পরিত্যাগ করেন নি।

এই ধুতি-চাদর-চটিজুতো-পরা ভারতের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একবার কোনও বিশেষ কাজে লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ধুতি-চাদর-চটিজুতো-পরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখে লাটসাহেবের প্রাসাদের ফটকে সেপাইরা তাঁকে যেতে দিলে না। বিদ্যাসাগর অমনি ফিরে চললেন। সেই খবর হঠাৎ কেমন ক'রে লাটসাহেবের কানে গেলো।

তাড়াতাড়ি লাটসাহেব ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। খানিকটা গিয়েই বিদ্যাসাগরকে তিনি বিশেষ অনুরোধ কোরে নিজের প্রাসাদে ফিরিয়ে আনলেন।

কথায় কথায় লাটসাহেব বিদ্যাসাগরকে বললেন, সায়েবী পোষাক পরা থাকলে ফটকে সেপাইরা আপনাকে রুখতো না—সহজেই পথ ছেড়ে দিতো।

লাটসাহেবের সেই কথায় বিদ্যাসাগর সতেজে উত্তর দিলেন, লাটসাহেবের বাড়ীতে যেতে হ'লে তাঁকে যদি নিজের জাতীয় বেশ ত্যাগ কোরে বিদেশী পোষাক পরতে হয়, তাহলে কিছুতেই তিনি আর লাটসাহেবের বাড়ী যাবেন না। নিজের বাপঠাকুর্দ্দাদার ধারা তিনি কিছুতেই বদলাবেন না।

জাতির জাতীয়তাই তার অস্তিত্ব। যতদিন জাত আছে, ততদিন সেও আছে। এ কথা পৃথিবীর সকল জাতিই জানে। তাই জাতির জন্যে তারা প্রাণ দেয়।

আমরা দেখেছি, রাজনৈতিক বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ইংরাজ পৃথিবীর সর্বত্র গিয়েছে, কিন্তু কোনদিনই তারা নিজের দেশকে এবং জাতিকে ভোলেনি। এই দেশ-প্রীতি এবং জাতীয়ত্বের সচেতনতাই আজ তাদের এত বড় করেছে। তারা হাজার অসুবিধা ভোগ ক'রেও অপরদেশের একটি ছুঁচ পর্য্যন্ত ব্যবহার করে না। তারা জানে, এ ক্ষতি শুধু তার নিজের দেশের নয়, তার জাতির। ইংরাজদের মতন আমেরিকান জার্মান ফরাসী ইটালিয়ান রাসিয়ান জাপানী চানা সব দেশের লোকেরাই জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। জাতির সঙ্গে দেশের শিল্প এমনি করেই বড় হয়।

খাদ্য বিষয়েও তাদের মানসিক দৃঢ়তা অনুকরণীয়। এতকাল

ভারতবর্ষে বাস ক'রেও, তারা ভারতের খাদ্য গ্রহণ করে নি—যা আমরা নিত্য ক'রে থাকি। আমরা অনেকেই চীনা হোটেলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে আসি, আর সাহেবি-খানা না হ'লে আজ আমাদের অনেকেরই চলে না। আমাদের মতন কসমোপলিটন জাত পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

আজকের মানুষ বিদ্যাসাগরের দানশীলতা, বিদ্যার পরিমাপ নিয়ে হয়তো বিচার করবেন, কিন্তু ভাবতেও পারবেন না—সেযুগে তাঁর এ কত বড় বিপ্লব! যদিও তিনি বিদ্যা ও অশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন, তবু বিদ্যার জন্যেই শুধু নয়, দয়ার সাগর ব'লেও—উনিশ শতকের জাতীয় প্রতীক হিসেবে আজ তিনি সকলের নমস্য।

একদিন মাইকেল মধুসূদন বলেছিলেন, ওঁর মত সরল উদার মানুষ আমি দেখিনি, কিন্তু ঐ গোড়া পণ্ডিতের ভেতরে আগুন আছে—যে-আগুনকে আমি ভয় করি। আবার তাঁর মতো পরম বন্ধুও আমার নেই। সে অগ্নিমূর্ত্তি আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি।

বিদ্যাসাগর রান্না ক'রে, বাপ-মাকে খাইয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেছেন; একথা তিনি কোনদিনই ভোলেন নি। এই বাপ-মা ছিলেন তাঁর কাছে দেবতা। একবার পাড়াপ্রতিবেশীরা দলবেঁধে কাশী যাচ্ছেন বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করতে। বিদ্যাসাগরকে তাঁরা যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। তিনি তার উত্তরে তাঁর বাপ-মাকে দেখিয়ে বললেন, এঁরাই আমার বিশ্বেশ্বর-বিশ্বেশ্বরী।

এ কথা আজকের দিনে কে বিশ্বাস করবে! কিন্তু এই আদর্শের মধ্যেই পাবো আমরা ভারত-আত্মাকে।

আজ জাতির সেই লুপ্ত-গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে হবে।